'মিলনী'

সাহিত্য সংখ্যা ১৩৮৬/১৯৭৯

পরিচালনায়ঃ

মিলন সংঘ (পাঠাগার বিভাগ)

৯৩, শেঠবাগান রোড

কলিকাতা-৭০০ ০৩০

সম্পাদক মণ্ডলীঃ

শক্তিব্রত মুখোপাধ্যায়

পরিমল দাসমুন্সী

প্রশান্ত কুমার ঘোষ

মুকুল কান্তি দাস

অমৃতলাল চক্রবর্তী

প্রচ্ছদ: সুপ্রিয় সরকার।

মিলন সংঘের বর্তমান (১৯৭৯) বৎসরের কার্য্যকরী সমিতি

* উপদেষ্টামণ্ডলী—ননীগোপাল ব্যানার্জি, নির্মাল্য কান্তি বসু, গৌরহরি বিশ্বাস, অসীম চক্রবর্ত্তী, শিবনাথ চ্যাটার্জী, অরিজিৎ গুহ
* সভাপতি : পরিমল দাসমুন্সী
* সহ সভাপতি : সুশীল মজুমদার ; দিলীপ রায়
* সাধারণ সম্পাদক : প্রাণতোষ মজুমদার
* সহ সম্পাদক : প্রশান্ত কুমার ঘোষ
* পাঠাগারাধ্যক্ষ : শক্তিব্রত মুখোপাধ্যায়
* উন্নয়ন ও পরিকল্পনা : দেবদাস বসু
* ক্রীড়া সম্পাদক : অরুণ চক্রবর্ত্তী
* সাংস্কৃতিক সম্পাদক : মুকুল কান্তি দাস
* ব্রতচারী ও সমাজ উন্নয়ন সম্পাদক : মৃন্ময় চন্দ
* কোষাধ্যক্ষ : অরবিন্দ মজুমদার
* হিসাব পরীক্ষক : ননীগোপাল ব্যানার্জি

বিষয়		পৃষ্ঠা

: কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

* ডঃ রমা চৌধুরী
* স্বপনবুড়ো
* শৈলেশ দে
* বেদুইন
* শক্তিপদ রাজগুরু
* চিরঞ্জীব সেন
* নটরাজন
* শিশির কর
* শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
* সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ
* সুভাষ সমাজদার
* রবিদাস সাহারায়
* আব্দুল জব্বার

অচীন রায়

বিপুল বন্দ্যোপাধ্যায়

* প্রদীপ চক্রবর্তী

ও

* কানাই সুর

* সমীর চট্টোপাধ্যায়
* সত্যেন বিশ্বাস
* অধ্যাপিকা আরতি গঙ্গোপাধ্যায়

: সহযোগিতায় :

অরিজিৎ গুহ, কানাই পাল, বিবেকানন্দ মজুমদার, সুবিমল ব্রহ্মচারী প্রণব্রত মুখোপাধ্যায়, সুনীলচন্দ্র দাস, সুধীর রায়।

সংঘের সকল সভ্য ও সভ্যাবৃন্দ ও সকল বিজ্ঞাপনদাতাগণ।

সূচীপত্র

বিষয়

"আর্ট মানে কেবলমাত্র চিত্রকলা নয়,

মানুষের বিচিত্র রস সৃষ্টির কাজ।"

— রবীন্দ্রনাথ

"As I would

Not be a master,

So I would not

Be a slave."

—Abraham Lincon.

সম্পাদকীয়-

'মিলনী' আস্তে আস্তে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এত তাড়াতাড়ি সে সকলেরই প্রিয় হয়ে উঠবে তা আমরাও আশা করি নি। 'মিলনী'র সাফল্যে উৎসাহী পাঠক-পাঠিকাবৃন্দ ও শুভাকাঙ্খীরা দাবী জানিয়েছিলেন একখানি 'সাহিত্য-সংখ্যা' প্রকাশের জন্য। আমরাও এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছি। কিন্তু কাজটি বাস্তবিকই খুব দুরূহ।

শুধু দুরূহই নয়, পত্রিকা প্রকাশ ভীষণ ব্যয় সাপেক্ষ। প্রথমত লেখা সংগ্রহ করা। বিশেষ করে এই সময়ে। কারণ খ্যাতনামা লেখক লেখিকারা প্রতিষ্ঠিত, প্রচারসর্বস্ব বাণিজ্যমুখী পত্র-পত্রিকাগুলিকে সমৃদ্ধ করতে বহু বিনিদ্র রজনী যাপন করেছেন। বলা বাহুল্য নিঃস্বার্থভাবে নয়। কিন্তু 'মিলনী'র মত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পত্রিকার পক্ষে খ্যাতনামাদের লেখা কোন প্রকার সম্মান দক্ষিণা ব্যতীত সংগ্রহ করা প্রায় অসম্ভব। তারপর আছে মুদ্রন কাগজের গগনচুম্বি মূল্য।

কিন্তু আমরা গভীরভাবে বিশ্বাস করি 'ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়' এই প্রবাদ বাক্যটিকে। বিশেষতঃ 'ইচ্ছা' যদি 'সদিচ্ছা' হয়। তাই দুরূহ কার্য্যটি সম্ভবপর হলো। সকলের শুভচ্ছোয় ও অকৃপণ সহযোগিতায় প্রকাশিত হলো 'মিলনী সাহিত্য সংখ্যা'। এই সংখ্যাটির সর্বাঙ্গ সুন্দর করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। কতটা সফল হয়েছি, সে বিচারের ভার আপনাদের। এই সংখ্যায় বিভিন্ন প্রকারের সুচিন্তিত প্রবন্ধ যেমন প্রকাশিত হলো, তেমনি প্রকাশিত হলো কবিতা, ছোট-বড় গল্প। ছোটদের উপযোগী ও কিছু কিছু লেখা এতে দেওয়া হলো। প্রতিষ্ঠিত লেখকদের পাশাপাশি স্থান দেওয়া হয়েছে কিছু কিছু ভবিষ্যত প্রতিভাকেও। এই প্রসঙ্গে নিবেদন করি যে, ভবিষ্যত সম্ভাবনাময় কিছু প্রতিভা যাচাইয়ের জন্য আমরা এক স্বরচিত কবিতা ও ছোট গল্প প্রতিযোগিতার আহ্বান করেছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে কবিতার ক্ষেত্রে যদিও কিছু সাড়া পেয়েছি, ছোট গল্পের ক্ষেত্রে তেমন

উৎসাহ পরিলক্ষিত হয় নি। তাই শুধুমাত্র স্বরচিত কবিতা প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে পেরেছি। তিনজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদের বিচারে নির্বাচিত প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় কবিতা পূর্ব ঘোষণানুযায়ী এই সংখ্যায় প্রকাশিত হলো।

এই সংখ্যাকে সমৃদ্ধতর করতে যাঁরা নিঃস্বার্থভাবে আমাদের সাহায্য করেছেন তাঁদের সকৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। সবশেষে ধন্যবাদ জানাই 'মিলনী'র শুভাকাঙ্খী বন্ধুবর কানাই সুরকে, যিনি এই পত্রিকা প্রকাশে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন।

আপনাদের সকলের আশীর্ব্বাদ 'মিলনী'র উপর বর্ষিত হোক। তার চলার পথ হোক দীর্ঘতর। আজকের কিশলয় আগামী দিনে বনস্পতি হয়ে উঠুক। সার্থক হোক তার জন্ম। জয়তু।।

আমাদের কথা

—প্রাণতোষ মজুমদার
সাধারণ সম্পাদক, মিলন সংঘ।

চরৈবেতী—চরৈবেতী—চরৈবতী। অর্থাৎ এগিয়ে চল, এগিয়ে চল, এগিয়ে চল। এই এগিয়ে চলার মন্ত্রে দীক্ষিত 'মিলন সংঘ' এগিয়ে চলেছে আজ তিরিশ বছর ধরে। একটা সংঘের পক্ষে তিরিশ বছর ধরে পথ-পরিক্রমা বড় সহজ কথা নয়। বিশেষ করে সে পথ যখন বন্ধুর পথ। তবুও সে চলেছে। চলছে লক্ষ্যকে সামনে রেখে বহু বাঁধা-বিঘ্নকে জয় করে, বজ্র-কঠিন মনোবল নিয়ে। এ চলা শুরু সেই সুদূর অতীত থেকে। তার জন্মলগ্ন ১৯৪৯ সালের ২৪শে জানুয়ারী থেকে। ১৯৪৯ থেকে ১৯৭৯, অনেক দীর্ঘ কাল অনেক কথা। আজ 'মিলনী-সাহিত্য সংখ্যা' প্রকাশ লগ্নে পূর্ব স্মৃতি বড় মুখর হয়ে উঠে—

১৯৪৯ সালের ২৪শে জানুয়ারী, একটি স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে স্থাপিত হলো একটি প্রতিষ্ঠান। জন্ম হল একটি সংকল্পের, একটি সদিচ্ছার। দমদমের শেঠবাগান অঞ্চলের কতিপয় তরুণ সেদিন স্থাপন করেছিলেন একটি প্রতিষ্ঠান, এই আশা নিয়ে যে, প্রতিষ্ঠানটি ভবিষ্যতে এতদাঞ্চলে সগর্বে মাথা তুলে দাঁড়াবে। যার সুযোগ্য নেতৃত্বে স্থানীয় তরুণেরা পাবে সঠিক পথের নিশানা। পাবে সঠিক পথের সন্ধান। সেদিন সেই তরুণদের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন কিছু অভিভাবক। নতুন গড়ে উঠা পল্লীতে একটি আদর্শ সংঘ স্থাপনের প্রয়োজনীতা তাঁরাও স্বীকার করেছিলেন। তারপর বহু প্রতিকুল অবস্থা পেরিয়ে, স্থাপিত হলো সংঘ, বহু প্রতিরোধ জয় করে নাম দেওয়া হল "মিলন সংঘ"। সবাইকে আহ্বান জানানো হল এই মিলন মঞ্চে এসে সমবেত হতে। সকলের মিলনে সকলের প্রচেষ্টায় উন্নতি হোক পল্লীর, মঙ্গল হোক সকলের।

যাত্রা হলো শুরু মাত্র এক টুকরো জমির উপরে ছোট একটি পুরাতন জীর্ণ ঘরে। রচিত হলো সংবিধান, গঠিত হলো কমিটী, শুরু হলো কাজ।

সরকারী অনুমোদনও অচিরে পাওয়া গেল। আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পেলো সভ্য সংখ্যা। সংঘের বিভিন্ন বিভাগ খোলা হল। ফুটবল, ভলি, ক্রিকেট-ক্যারাম-দাবার সাথে খোলা হল ব্যায়াম শরীর চর্চা বিভাগও। খোলা হল সমাজ কল্যাণ বিভাগ খোলা হল পাঠাগার বিভাগ। এক কথায় অন্তর্বিভাগীয় ও বহির্বিভাগীয় প্রায় সকল প্রকার ক্রীড়া চর্চা শুরু হল। ইতিমধ্যে 'সব পেয়েছি আসরের' সাথে যুক্ত হয়ে 'মিলনী সব পেয়েছি আসর' নামে ছোটদের একটি বিভাগও খোলা হল। ছোটদের নিয়মিত ভাবে শরীর চর্চার সাথে শেখান হল লাঠি খেলা, ছুরি খেলা। সমাজ কল্যাণ বিভাগ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলল, পল্লীর সেবায়. পল্লীর যে কোন সৎকাজে সংঘের সভ্যবা ঝাপিয়ে পড়ল। পাঠাগার বিভাগের শ্রীবৃদ্ধি ঘটল। পাঠাগার বিভাগ থেকে 'মিলনী' নামে একটি হাতে লেখা পত্রিকা প্রকাশিত হল নিয়মিত ভাবে। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পাঠ্য-পুস্তক বিতরণ করা হল। উপরন্তু বেশ কিছুকাল সংঘ গৃহের স্বল্প পরিসরে দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে "Free coaching class" চালু করা হল। যুবশক্তিতে বলীয়ান তারুণ্যে ভরা মিলন সংঘ সর্বদাই সামাজিক সকল দায়িত্ব পালন করে যেতে লাগল জটীল রাজনীতির উর্দ্ধে থেকে।

কালক্রমে শাখা প্রশাখা প্রসারিত করে মিলন সংঘ পরিণত হল এক মহীরুহে। সংযোজন হল ব্রতচারী বিভাগের। শিশু ও কিশোরদের কাছে উন্মুক্ত হল নতুন দ্বার ব্রতচারী, নাচগান, ব্যাণ্ড বাদ্য, শরীর চর্চ্চা প্রভৃতি শিক্ষার মাধ্যমে।

আজ মিলন সংঘ কৈশোর কাটিয়ে যৌবনে প্রবেশ করেছে। স্থান পেয়েছে নিজস্ব দ্বিতল অট্টালিকায়। এছাড়াও নিজস্ব জমিতে ব্যবস্থা করেছে খেলাধূলার।

এই সংঘকে তিলে তিলে গড়ে তুলতে যাঁরা সবকিছু দিতেও প্রস্তুত ছিলেন তাঁদের সর্বাগ্রে জানাই অন্তরের গভীরতম শ্রদ্ধা। যে সমস্ত শুভানুধ্যায়ী এই সংঘকে গড়ার কাজে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহযোগীতায় হাত বাড়িয়েছেন তাঁদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

কর্মে ধর্মে আদর্শে আচরনে 'মিলন সংঘ' হোক সকলের মিলন ক্ষেত্র। জয়তু।

"দারিদ্র-দুঃখ-ভয়হারিণি !"

—ডক্টর রমা চৌধুরী

'দারিদ্র দুঃখ-ভয়হারিণি ক্য ত্বদন্যা।
সর্বোপকারকরণায় সদার্দ্র চিত্ত ।।"

[শ্রীশ্রী চণ্ডী ৪/১৭]

"দারিদ্র্যহারিণী দুঃখ তারিণী ভয়নিবারণী
তুমি ছাড়া আর কে আছে বল।
সর্বজনের উপকার হেতু
করুণা বিগলিত অবিরল ।।"

[শ্রীশ্রী চণ্ডী ৪/১৭]

অশেষ শুভ ৺শ্রীশ্রী মাতৃপূজাকালে আমরা সকল দুর্গতিনাশিনী ৺শ্রীশ্রী দুর্গার বন্দনাগানে দিগ্‌বিদিগ মুখরিত করছি সানন্দে সশ্রদ্ধায়। তাঁকে আমরা **বিশেষভাবে** স্তুতি নিবেদন করছি উপরের অতি সুন্দর, অতি সুমিষ্ট অতি সুযোগ্য **বিশেষণটী** দিয়ে— 'দারিদ্র-দুঃখ-ভয়হারিণী—।' অর্থাৎ তিনি আমাদের **এই ভীষণ সংসারজীবনের** তিনটী—প্রধান দুর্ধর্ষ বস্তু দূর করেন, যা আমরা আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি দিয়ে পারি না—অর্থাৎ "দারিদ্র", "দুঃখ" এবং "ভয়", এবং সেইজন্যই তাঁকে অসীম বিশ্বাসভরে অনন্ত আশাসহকারে অপরিসীম আনন্দ সহকারে বলা হয়েছে—"দারিদ্রহারিণী" "দুঃখতারিণী' এবং 'ভয়নিবারণী"।

কেবল প্রথমটাই এক্ষেত্রে ধরা যাক—তিনি "দারিদ্র্যহারিণী"। 'দারিদ্র্য"-কে সাধারণতঃ আমরা কেবলমাত্র পার্থিব দিক থেকেই, দৈহিক দিক থেকেই দেখি। অর্থাৎ তাঁকেই আমরা "দরিদ্র বলি, যাঁর সাংসারিক দিক থেকে দৈহিক দিক থেকে ধন জন-মান সম্মান-পদ প্রভৃতি কিছুঃ নেই। কিন্তু ভারতীয় শাস্ত্র মতে আমাদের মধ্যে যখন তিনটী বস্তু আছে—অর্থাৎ দেহ-মন ও আত্মা তখন সেই তিনটী দিক্ থেকেই এক্ষণে 'দারিদ্র্যকে' ধরতে হবে, এবং বুঝতে হবে যে পরমকরুণাময়ী পরমা জননী **এই তিনটী বস্তুরই**— অর্থাৎ দেহ-মন এবং আত্মা ই "দারিদ্র্য হারিণী ।'

দৈহিক 'দারিদ্র্যের'' কথা আমরা সকলেই পরিপূর্ণভাবেই জানি, অনেক চোখের জলের সঙ্গেই অনেক বুকের দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গেই, অনেক চিত্তের হা হুতাশের সঙ্গেই পরিপূর্ণভাবে জানি। সেই সঙ্গে আমরা একথাও স্থিরভাবে বিশ্বাস করি যে 'সহার্দ্র চিত্তে সর্বদাই করুণাবিগলিত হৃদয়া বিশ্বজননী—আমাদের সাংসারিক অন্ন-বস্ত্রের সমস্যারও সমাধান করবেন সানুগ্রহে। কিরূপে? তিনি আমাদের এরূপ কাজে ক্ষমতা দেবেন যে যাতে আমরা সুষ্ঠু সুন্দর সৎ নাগরিকের জীবন যাপন করতে অনায়াসেই পারি। অর্থনৈতিক দিক্ থেকে ধনী ব্যবসায়ী না হয়েও, রাজনৈতিক দিক্ থেকে প্রভাবশালী নেতা না হয়েও, রাষ্ট্রিয় দিক থেকে উচ্চপদাভিষিক্ত অফিসার না হয়েও। এরূপ শক্তি আমাদের সকলের মধ্যেই রয়েছে আদ্যন্তকাল ক্ষোভ করোনা, লোভ করো না, দোষ করো না, রোষ করো না, শোক করো না, ক্ষোভ করো না—কেবল সম্পূর্ণ নিষ্কামভাবে—।'' সৎ করোমি জগন্মাতস্তদেব তব পূজনম—আমি যা কিছুই করি হে জগন্মাতা—সবই তোমার পূজা—।'' এরূপ ভাব নিয়ে সবই শ্রীভগবানের কর্মরূপে, সব তাঁরই শ্রীচরণ সরোজে অর্পন করে, যদি স্ব স্ব সাধারণ কর্তব্য কর্ম করে চলি, তাহলে সাংসারিক দিক থেকেও দৈহিক দিক থেকেও, সাধারণ জীবনের দিক থেকেও আমাদের ''দারিদ্র্য'' দূর হবেই হবে, অতিশয় ধনী-মানী-উচ্চপদাধিষ্ঠিত হয়তো আমরা হব না; কিন্তু হব সুনাগরিক হব প্রকৃত মানুষ, হব সর্বোপরি পরমাজননীর পরমাদরের সন্তান; এবং সেজন্য হব স্ব স্ব দিক্ প্রকৃতশান্তি, প্রকৃত সন্তোষ প্রভৃত আনন্দের অধিকারী সতত সেই ''শান্তি'' যথাযথভাবে স্ব স্ব নির্দিষ্ট কর্তব্যকর্ম করে যাবার ''শান্তি'' সেই 'সন্তোষ' স্ব স্ব বিবেকবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয়ে? চলার ''সন্তোষ''; সেই ''আনন্দ'' বিশ্বমাতার প্রিয় সন্তান রূপে গেয়ে যাবার ''আনন্দ''। ৺শ্রীশ্রী দুর্গা ষড়ৈশ্বর্যশালিনী, অনন্ত-অচিন্ত্য-গুণশক্তিধারিনী, সর্বব্যাপিনী সকল দেব দেবী সমন্বয়রূপিণী অথচ তিনি অশেষ দয়া ক্ষমা সেবা প্রতিমা পৃথিবীর তথাকথিত ক্ষুদ্রা তিক্ষুদ্র তুচ্ছাতিতুচ্ছ দীনাতিদীন জীবও তাঁরই শ্রীচরণাশ্রিত তাঁরই ...... তাঁরই বক্ষোধৃত। তাহলে আর আমাদের ভয় কি, ভাবনা কেন? হতাশা কোথায়?—ওঁ শান্তিঃ।

'রকেট'

—কানাই সুর

[মিলন সংঘের পাঠাগার বিভাগ আয়োজিত স্বরচিত কবিতা প্রতিযোগিতায় প্রথম নির্বাচিত]

অনন্ত আকাশে বীরত্বের লড়াই ;
রাশিয়ার রকেট মার্কিনেরও তাই।
ক্ষতবিক্ষত সাধারণ মানুষ—
জীবন যুদ্ধে হেরে,
দিচ্ছে শুধু ভাগ্যের দোহাই।
আমিও রকেট।
জীবনের সীমাহীন পথে।
আমাকে ছাড়েনি কেউ,
জীবনের তাগিদে নিজেই ছেড়েছি নিজেকে।
জানি না আমার পরিণতি,
হয়'ত হঠাৎ মিলিয়ে যাব,
টুকরো হ'য়ে যাব জীবন চক্রে,
নিভে যাবে সব আশার আলো,
পৃথিবীর যতকিছু ভাল—
শেষ হ'য়ে যাবে
সব চাওয়ার বিরাট টানে।
তারপর—শুধু অন্ধকার।

থৈ থৈ সবুজিমা

—মৃণালেন্দু দাশমুন্সী

[মিলন সংঘের পাঠাগার বিভাগ আয়োজিত স্বরচিত কবিতা
প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় নির্বাচিত]

রিকশা চেপে ষ্টেশন থেকে যেতে কিছুদূর—
ইতস্ততঃ সজ্জাহীন, বৈরাগী বালিয়াড়ী
সংকেতে বলে ইসারায়, এসে গেছো অভিষ্ট পথে,
যাও আর একটু ঘুরে।
আর তারপর, এসে গেলো স্বপ্নিল পুরীর সমুদ্র সৈকত !
নারিকেল ঝাউবন আড়ালের থেকে, শব্দ ওঠে টকাটক যেন ধাবন্ত ঘোড়া ;
কিন্তু ঘোড়া নয়, অবাক বিস্ময় করা অগনন ঢেউ
শুভ্র-নীল—সমুদ্রের তরঙ্গমালা।
ওঠে ঢেউ—পড়ে ঢেউ—নাচে ঢেউ থৈ থৈ,
উল্লসিত-প্রাণোচ্ছল উন্মাদ সাগর !
এরূপের ভাজ নেই, নেইও বুঝি ছবি
মুগ্ধ হয়ে চুপে দেখে অতলান্ত আঁখি।
শুধু এক শঙ্খচিল, ডানায় অবিরত আঁকে আলপনা
তাই দেখে নুলিয়াটা হু'স করে ছাড়ে তার ডিঙ্গা।
মস্তকে পূর্ণ্যার্থী জল ঢালে সর্তকে ঘটিতে,
যৌবনচঞ্চল নরনারী খেলা করে সমুদ্রের সাথে বালির সৈকতে।

সৈনিক

—অশোক দত্ত

['মিলন সংঘের পাঠাগার বিভাগ আয়োজিত
স্বরচিত কবিতা প্রতিযোগিতায় তৃতীয় নির্বাচিত]

কমরেড, আমি এই পৃথিবীর বুকে হেটে যাই
তরাইয়ের বিস্তির্ণ প্রান্তর থেকে
তাচাইয়ের আঁকা বাঁকা পথে।
জানি, গত যুদ্ধে আমার ভাই নিহত হয়েছে
আমার ধর্ষিতা মায়ের লাস ভেসে
গেছে বুড়ি গঙ্গার ক্ষীণ স্রোতে।
তবু, আমি সৈনিকের বেশে কুচকাওয়াজ করি
আমি গান গাই কমরেড লেলিনের।
আমার রাইফেল গান গায়, কবিতা যেখানে বারুদ হয়।
আমার কবিতা বারুদ হয়, মৃত্যু যেখানে জীবন হয়।
যখন, পোয়াতী মাঠে সন্ধ্যা ঘনায়
নীলাভ স্বপ্নের ছায়া পরে কিষানীর চোখে।
কুয়াশা ভেজা রাত্রির বুকে, আমি জেগে থাকি
একা প্রহরীর বেশে।
কারণ, এই পৃথিবী আমার, এই পৃথিবী তোমার,
কমরেড এই পৃথিবী আমাদের।

স্কেচ/ সুকান্তের 'রানার' অবলম্বনে

সত্যের সন্ধান

—তরুণপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়

একটা সভা হবে
শ্রমিককে ঘিরে উঠবে বুদ্ধিজীবীর ঝড়
রাজনীতিবিদ নৃতত্ত্ববিদ বৈজ্ঞানিক এবং কবিও
সবাই চলেছে সভার দিকে।
রাজনীতিবিদ বললেন—
ও ব্যাটা নুয়ে পড়েছে, ছাঁটাই করো।
নৃতত্ত্ববিদ, মানুষের ইতিহাস সন্ধান যার অভ্যেস
বললেন, মনসুরের বাপ-ঠাকুরদা বিশ্বকর্মার জাত ছিল
ও ইচ্ছে করলে একাই পৃথিবী গড়তে পারত।
বৈজ্ঞানিক হাতের টেষ্টটিউবে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রেখে
ওর জীবনীশক্তিই ফুরিয়ে গেছে।
একে একে সবার বলা শেষ
এবার কবির পালা।
কবি সোজা উঠে দাঁড়ালেন,
তাঁর সত্যসন্ধানী দুটি চোখ
মনসুরের উপর রাখলেন কিছুক্ষণ,
তারপর বললেন—
মনসুর আজকাল খুব স্বপ্ন দেখতে শিখেছে
তাই সে আর নিষ্প্রাণ মাত্র বলটু লাগাবে না
বরং পৃথিবীর মানুষকে মুক্তির স্বপ্ন দেখতে শেখাবে ॥

সত্য যে কঠিন

শৈলেশ দে

মিলনী সম্পাদকের দাবী — স্বাধীনতা সংগ্রামের না-বলা অধ্যায় সম্বন্ধে আমাকে কিছু লিখতে হবে। কি হবে লিখে! নিস্তরঙ্গ নদীর বুকে ঢেউ তুলে লাভ আছে কিছু?

'দেশ বরেণ্য ব্যক্তি' বলে রাষ্ট্র যাকে নানাভাবে সম্মান জানিয়েছে, এখনো জানাচ্ছে, আমি যদি বলি যে, ঐ দেশবরেণ্য ব্যক্তিটি ব্রিটিশ আমলে একজন পয়লা নম্বরের গুপ্তচর ছিলেন, তাহলে আপনাদের এতদিনকার বিশ্বাসে একটা প্রচণ্ড আঘাত লাগবে না কি?

সেদিন ঐতিহাসিক আগস্ট আন্দোলন দমন করার জন্য মধ্যপ্রদেশর অষ্টি ও চিমূরের সমস্ত নারীকে ধর্ষণ করা হয়েছিল। কার নির্দেশ? কে সেই লোক?

আমি যদি বলি যে, আজ যারা ন্যায় ও নীতির ধারক বলে সর্বত্র পরিচিত তাদেরই একজন সেই কুৎসিত কাণ্ডের নায়ক, তাহলে শুনতে কারো ভাল লাগবে কি?

গত ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা দিবসে বহু বাঙালী তরুণের কণ্ঠেই আমি নেতাজীর জয়ধ্বনি শুনেছি। আমি যদি বলি যে, এই বাংলা দেশেরই একদল তরুণ ১৯৪৪ সালে নেতাজীকে হত্যা করবার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সাব-মেরিণ যোগে থাইল্যাণ্ড গিয়েছিলেন, তাহলে বাঙালী হিসেবে কারো বুকটা উঁচু হয়ে উঠবে কি?

একালের ইতিহাস স্তবকতার ইতিহাস। তাই খেয়াল-খুশিমত তাকে ভাঙতে ও গড়তে কোন বাধা নেই। আগষ্ট আন্দোলনের বীরাঙ্গনা শহীদ মাতঙ্গিনী হাজরার কথাই ধরা যাক। ইতিপূর্বে মেদিনীপুরে তাঁর মর্মর মূর্তি স্থাপিত হয়েছে। প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর উপস্থিতিতে তমলুকে। সবশেষে গত ৯ই আগষ্ট কলকাতায়।

খুবই আনন্দের কথা সন্দেহ নেই। তবু মনে একটা প্রশ্ন জাগে। সেদিনতো একাই তিনি প্রাণ দেননি, একই ঘটনায়, একই সঙ্গে পুরীমাধব প্রামাণিক, নগেন্দ্রনাথ সামন্ত, জীবনচন্দ্র বেরা এবং তেরো বছরের কিশোর লক্ষ্মীনারায়ণ দাসও শহীদের মৃত্যু বরণ করেছিলেন পুলিশের গুলিতে। কেন তারা হারিয়ে গেলেন ইতিহাস থেকে? কেন তাদের নামগুলি বারেকের জন্যও উচ্চারিত হলনা কোন একটি অনুষ্ঠানে?

সবশেষে ইম্ফলের উপকণ্ঠ ময়রাং। মহাক্ষত্রিয় নেতাজী সুভাষ এখানেই তাঁর হেড কোয়ার্টার্স স্থাপন করেছিলেন ১৯৪৪ সালে।

প্রথমেই চোখে পড়ে একটি কাঠের ফলক। ১৯৫৫ সালে এই ফলকটি স্থাপন করেছিলেন তখনকার সময়ের কংগ্রেস সভাপতি স্বয়ং ঢেবর সাহেব।

কিন্তু কি লেখা রয়েছে ফলকটির গায়ে! লেখা রয়েচে—'আমরা তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি, যারা নেতাজী সুভাষ বসুর নেতৃত্বে এখানে লড়াই করে প্রাণ দিয়েছেন।' তারপরই লেখা রয়েছে—'in their own way'.

এই 'in their own way' কথাটির মানে? এর সহজ সরল অর্থ কি এই নয় যে, যদিও আমরা ওদের শ্রদ্ধা জানাচ্ছি, তবু ওরা আমাদের দলের কেউ নয়। ওরা আলাদা সমাজের।

কি বলবো এই কাঠের ফলকটিকে! এটি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, নাকি লোক দেখানো ভড়ং?

প্রত্যহ যারা ঘৃণিত ও পদানত
দেখ আজ তারা সবেগে সমুত্থিত,
তাদেরই দলের পিছনে আমিও আছি,
তাদেরই মধ্যে আমিও যে মরি—বাঁচি।"

—সুকান্ত

বাংলা সাহিত্যে শিশু-নাটিকা

স্বপনবুড়ো

ছোটদের নাটক সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে সর্বপ্রথম আমাদের সকল নাটের গুরু রবীন্দ্রনাথের কথাই আগে মনে পড়ে।

মাত্র গুটি কয়েক ছেলে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ভুবন ডাঙার মাঠে বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপন করেছিলেন। কিছুদিন বাদেই তাদের নিয়ে অভিনয় করানোর প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করেন। এইভাবে রবীন্দ্রনাথ ছোটদের জন্যে নাটক লিখতে সুরু করেন। একথা বলা যায় যে, ছোটদের ভালোবেসেই তিনি শিশুনাট্য রচনায় কলম ধরেন। প্রথমেই "মুকুট" নাটকটির কথা মনে জাগে। এই নাটকটি শুধু ছেলেদের জন্যেই রচিত হয়েছিল। কবিগুরুর "ডাকঘর" আর একটি উল্লেখযোগ্য শিশু-নাটিকা। এই নাটিকা অভিনয়কালে তিনি নিজেও অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই নাটকে রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ এমন কি বালক সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত অংশ গ্রহণ করেছিলেন একথা আমারা সৌমেন্দ্রনাথের কাছেই জানতে পারি। "বিসর্জ্জন" নাটকও কিশোর কিশোরীর দল বহু যায়গায় অভিনয় করে খ্যাতি অর্জন করেছেন —একথা নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি। রবীন্দ্রনাথ নিজে এই "বিসর্জন" নাটকে কখনো জয়সিংহ এবং কখনো রঘুপতির ভূমিকায় মঞ্চে অবতীর্ণ হয়ে দর্শক দলকে প্রচুর আনন্দ দান করেছেন। এই বিসর্জন নাটকটি কবি রচনা করেছিলেন সাজাদপুর কুঠি বাড়ীতে।

একটি কৌতুকজনক কথা হচ্ছে এই যে, রবীন্দ্রনাথ সারা জীবন তাঁর বহু নাটকের বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেও সর্বপ্রথম মঞ্চাবতরণ করেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের "অলীকবাবু" নাটকে। এই নাটক অভিনয় করে তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন।

রবীন্দ্রনাথ নিজে ছোটদের নাটকের জন্যে নানাভাবে চিন্তা করেছেন আর সারা জীবন ধরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। তাঁর নৃত্য নাট্যগুলি

যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। যথা বাল্মীকি প্রতিভা, মায়ার খেলা, চণ্ডালিকা, শ্যামা প্রভৃতি। মহলার সময় তিনি খুব যত্ন নিয়ে ছোটদের অভিনয় শেখাতেন। কেউ যদি বিশেষ একটি কথা উচ্চারণ করতে না পারতো তাহলে তিনি সেই কথাটি বদলে দিয়ে তার অভিনয়ের সুবিধা করে দিতেন।

রবীন্দ্রনাথের বৌঠাকুরুণ জ্ঞানদানন্দিনীদেবী ছোটদের অভিনয়ের জন্যে দুটি নাটক রচনা করেছিলেন। তার ভেতর একটি হচ্ছে "সাতভাই চম্পা" এবং আর একটি — "টাক ডুমাডুম"। মনে হয় "বালক" কাগজের জন্য তিনি এই নাটিকা দুটি রচনা করেছিলেন। পরে ঠাকুবাড়ীর ছেলেমেয়েরা এই নাটিকা দুটি অভিনয় করে সকলকে আনন্দ দান করে।

শিশুনাটিকার ব্যাপারে শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের উৎসাহ ছিল অসীম। এক সময়ে নাতি-নাতনীদের অভিনয়ের জন্যে তিনি অনেক উদ্ভট নাটক রচনা করেছিলেন। তার কিছু কিছু ঠাকুরবাড়ীর ছেলেমেয়েরা অভিনয়ও করেছিল। তিনি একদা পরশুরামের লম্বকর্ণ পালা নাট্যে রূপান্তরিত করেছিলেন। অনেক জায়গায় সে নাটক অভিনীতও হয়েছে। অবনীন্দ্রনাথ নিজে খুব ভালো অভিনয় করতে পারতেন। "ডাকঘর" নাটকে তাঁর 'মোড়ল' এবং "বৈকুণ্ঠের খাতায়" তিনকড়ি সকলের প্রশংসা লাভে ধন্য হয়েছে।

ছোটদের নাটক সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বহুদিন আগেকার একটি কাহিনী মনে পড়ছে।

রবীন্দ্রনাথ তখন আমাদের সাহিত্য গগনে উজ্জ্বল হয়ে আছেন। এমন দিনে একদিন "মৌমাছি" আর "অরূপ" (স্বামী প্রেমঘনানন্দ) আমার কাছে এসে উপস্থিত। তাঁদের প্রস্তাবটি অভিনব সন্দেহ নেই। বাংলাদেশের নামকরা শিশুসাহিত্যিকদের নিয়ে "ডাকঘর" মঞ্চস্থ করা হবে। আর সেই অভিনয়কালে কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনায় সেই নাটক রীলে করে কবিকে শান্তিনিকেতনে শোনানো হবে। পরিকল্পনাটি শুনে আমিও উৎসাহিত হয়ে উঠলাম। আমি তখন হরি ঘোষ ষ্ট্রীটে থাকতাম। সেখানে একটি বড় হলঘর ছিল। স্থির হল প্রতিদিন সন্ধ্যায় সেইখানে ডাকঘরের মহলা হবে।

যতদূর মনে পড়ে এই মহলায় এসে হাজির হতেন—কবি নরেন্দ্র দেব, গিরিজাকুমার বসু, মন্মথ রায়, নৃপেন্দ্র কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, মৌমাছি, প্রভাত কিরণ বসু, শিল্পী ধীরেন বল, বুদ্ধ্‌ভূতুম, জয়নাল আবেদীন, অরূপ (তিনি অবশ্য কোনো ভূমিকা গ্রহণ করেন নি; ব্যবস্থাপনায় ছিলেন), কবি সুনির্মল বসু এঁরা সবাই এসে একেবারে আসর জমিয়ে তুলতেন। ইন্দিরা দেবী আসতেন তাঁর ছোট বোনকে নিয়ে। সেই মেয়েটি সুধার ভূমিকায় অভিনয় করেছিল। অমলের ভূমিকায় দেখা দিয়েছিল মৌমাছির ছোট ভাই। যথা সময়ে ফার্ষ্ট এম্পায়ারে সেই ডাকঘর নাটক অভিনীত হল—কল্‌কাতার গুণীজন সমক্ষে। আর কল্‌কাতা বেতার কেন্দ্রের ব্যবস্থপনায় শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথকে শোনানো হ'ল। তারপর আমরা কিছুদিন পর কবির আশীর্ব্বাদ লাভ করে ধন্য হয়েছিলাম। এইখানে একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পরে আমরা যখন বেতারে ডাকঘর অভিনয় করি, সেই সময়ে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুরদার ঠাকুদার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন।

আমাদের বঙ্গ সাহিত্যে যাঁরা ছোটদের নাটক রচনা করে শিশুসাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করে গেছেন—তাঁদের নাটক সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন।

যোগীন্দ্রনাথ সরকার অবশ্য ছেটেদের জন্যে কোনো নাটক রচনা করে যান নি। তবু তাঁর অজস্র ছড়ার কিছু কিছু সংগ্রহ করে ছোটরা অভিনয় করে থাকে। নানা সাজ-সজ্জায় ছোটদের সেই সুন্দর অভিনয় বহুজনের মনোহরণ করে থাকে।

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার সম্পর্কেও সেই কথা বলা চলে। তবে ইদানিং তাঁর অনেক রূপকথা নাট্যে রূপান্তরিত করে অভিনীত হচ্ছে। শৈলেন ঘোষ তাঁর "অরুণ-বরুণ-কিরণ মালা" নাট্যে রূপান্তরিত ও মঞ্চে রূপদান করে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন।

কবি সত্যেন দত্ত কিশোরীদের জন্য "ধূপের ধোঁয়া" রচনা করে গেছেন। মেয়েদের নাটক এককালে অভিনয় করেছেন দেখছি। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় এক সময় 'মুক্তোর মুক্তি' নাটিকা রচনা করেছিলেন এবং নাট্যাচার্য শিশিরকুমার তাকে স্বল্প কালের জন্যে মঞ্চে রূপদান করেছিলেন। কবি নরেন্দ্র দেবের "ফুলের আয়না" সম্পর্কেও সে কথা বলা চলে। সাধারণ নৃত্য

নাট্য রূপেই সেটা শিশিরকুমার রূপদান করেছিলেন। শিশুনাট্য বলে কোনো বিজ্ঞপ্তি ছিল না।

এক সময় বঙ্কিম দাশগুপ্ত কয়েকটি কিশোর নাট্য রচনা করেছিলেন এবং ছেলেমহলে সেগুলি বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। উল্লেখযোগ্য নাটকগুলি হচ্ছে—চিতোর গৌরব, অভিষেক, আনন্দমঠ, কর্ণ, টাকার পূজা, ধ্রুব, নদের পাগল, প্রতাপ সিংহ, প্রেমের পথে প্রভৃতি।

সাংবাদিক কেশব চন্দ্র সেন এককালে ছোটদের জন্যে কয়েকটি নাটক রচনা করে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। বহু অঞ্চলে নাটকগুলি অভিনীত হতে দেখেছি। কয়েকটি নাটকের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে- কর্ণার্জুন, চন্দ্রগুপ্ত, জয় পতাকা, রাখাল রাজা, ভক্তের ঠাকুর প্রভৃতি।

শচীন সেনগুপ্ত যদিও বড়দের নাট্যকার, তবু তিনি ছোটদের কথা ভোলেন নি। সিংহাসন, তুষারকণা প্রভৃতি নাটিকা তিনি ছেলেমেয়েদের অভিনয়ের জন্য রচনা করে গেছেন।

ছোটদের নাটকের ক্ষেত্রে মন্মথ রায়ের দান অপরিসীম এবং অনস্বীকার্য। তাঁর রচিত "ছোটদের একাঙ্কিকা" ছোটদের নাটকের অভাব অনেকাংশে দূর করেছে। এছাড়া "কাজল রেখা" নামে একটি সুন্দর নাটিকা মেয়েরা বহু যায়গায় অভিনয় করে থাকে।

সুকুমার রায় ছোটদের একজন জনপ্রিয় লেখক। তিনিও ছেলেমেয়েদের জন্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাটক পরিবেশন করে গেছেন। তার ভেতর ঝালাপালা ও অন্যান্য নাটক শিশুমহলে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। সুকুমার রায়ের নাটকগুলি আগে সন্দেশে প্রকাশিত হয়। তারপর পুস্তকাকারে সিগনেট প্রেস নতুন করে ছোটদের হাতে লোভনীয় ও শোভনীয় করে তুলে দেয়।

ইন্দিরা দেবী "নন্দনের" ছেলেমেয়েদের দিয়ে কয়েকটি নাটক অভিনয় করিয়ে-ছিলেন। কিন্তু পুস্তকাকারে সেই নাটকগুলি আমার হাতে পড়েনি। তিনি বেতারের সঙ্গে দীর্ঘকাল জড়িত আছেন। সেইজন্যে বহু লেখকের নাটক তিনি বেতার থেকে প্রচার করেছেন এবং দেশের ছেলেমেয়েদের প্রচুর আনন্দ প্রদান করেছে।

সুনির্মল বসু একটি উল্লেখযোগ্য নাম। যিনি ছোটদের জন্যে সারা জীবন ধরে ভেবেছেন এবং তাঁদের জন্যে কয়েকটি সুন্দর ও অভিনয়যোগ্য নাটক রচনা করেছেন। সুনির্মল বসু হাসির কবিতা দিয়ে যেমন ছোটদের মন মাতিয়েছেন, ঠিক তেমনি ছোটদের নাটকেও তার হাস্যরসের অভাব নেই। তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটকগুলির নাম—আনন্দ নাড়ু, কিপ্‌টে ঠাকুর্দা, তেপান্তরের মাঠে, বন্দীবীর, বীর শিকারী, শহুরে মামা, শিশুনাট্য, প্রভৃতি।

যতদূর মনে পড়ে, খগেন্দ্র নাথ মিত্র ছোটদের অভিনয়ের উপযোগী একটি নাটক রচনা করেছেন। তার নামটি হচ্ছে "জন্মদিন"। ছেলেরা তাদের জন্মদিনে এই নাটকটি অনেক যায়গায় অভিনয় করে থাকে।

লীলা মজুমদার ছোটদের জন্যে কয়েকটি উপভোগ্য নাটক রচনা করেছেন। তার ভেতর বক বধ পালা এবং আরো কয়েকটি ছোট নাটক উল্লেখযোগ্য।

নারায়ণ গাঙ্গুলীর দুটি কিশোর নাট্য ছোটদের মন একেবারে জয় করে নিয়েছে। সব পেয়েছির আসরের প্রয়োজনে আমার দারুণ তাগিদে নারায়ণ বাবু এই দুটি নাটক রচনা করে দিয়েছিলেন।

তার ভেতর একটির নাম "ভাড়াটে চাই", অপরটির নাম "বারোভূতে"। "ভাড়াটে চাই" নাটকটি তিনি এক রাত্রি জেগে লিখে দিয়েছিলেন। আর নাম করা সাহিত্যিবৃন্দ সেই নাটকে অংশ গ্রহন করেছিলেন। এর ভেতর শৈলজানন্দ এবং প্রেমেন্দ্র মিত্রও ছিলেন।

শিবরাম চক্রবর্ত্তীর "পণ্ডিত বিদায়" নাটকটি দেশের কিশোর দল বহু যায়গায় সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করে থাকে। এছাড়া—"প্রাণকেষ্টর কাণ্ড" ও "বাজার করার হাজার ঠেলা" ছোটদের মনজয় করতে পেরেছে। শিবরামবাবুর "মামা ভাগ্নে" নাটকটিও কম উপভোগ্য নয়।

কাজি নজরুল ইসলাম ছোটদের জন্যে উপহার দিয়েছেন—"পুতুলের বিয়ে"। এই নাটিকাটিও কোনো কোনো যায়গায় অভিনীত হতে দেখেছি।

নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্য ছোটেদের জন্যে রচনা করেছেন—"জাগো রে ধীরে'। এ ছাড়া তাঁর অমরেশ সিরিজের কৌতুক নাটিকাগুলিও উল্লেখযোগ্য।

ধীরেন্দ্রলাল ধর ছোট ছেলেমেয়েদের জন্যে গোটা কয়েক নাটক রচনা করেছেন। তার ভেতর "সিদ্ধার্থ" এবং আরো কয়েকটি জীবন নাট্য উল্লেখযোগ্য।

কুমারেশ ঘোষ কিশোর-কিশোরীদের জন্য কয়েকটি নাটক আমাদের উপহার দিয়েছেন। তার ভেতর উল্লেখযোগ্য—চক্র, ফ্যাসান ট্রেনিং স্কুল ও ম্যানিয়া।

সুনির্মল বসুর ছোট ভাই সুকোমল বসু নাটক লিখেছেন ''পরীর ডানা।"

সাধারণ রঙ্গালয়ে প্রথম শিশুনাট্য অভিনীত হয় দক্ষিণ কলিকাতার কালিকা রঙ্গমঞ্চে। রাম চৌধুরী বিরাট অর্থব্যয়ে এর বিপুল আয়োজন করেছিলেন। স্বপনবুড়ো "বিষ্ণুশর্মা'' নাটক রচনা করেছিলেন। এই নাটক দেখে শ্রীচক্রবর্ত্তী রাজা গোপাল আচারিয়া ও ডঃ কৈলাশ নাথ কাটজু উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন এবং প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের "বিষ্ণুশর্মা" দেখতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। বাংলাদেশের শিশু সাহিত্যিক-বৃন্দ, হেমেন্দ্র কুমার রায় থেকে সুরু করে প্রায় প্রত্যেকেই নাকটটির অজস্র প্রশংসা করেছিলেন।

সাধারণ রঙ্গালয়ে দ্বিতীয় শিশুনাট্যের আয়োজন করেছিলেন বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চ। মৌমাছি এই নাটক রচনা করে দিয়েছিলেন। মণিমেলার ছেলেমেয়ের দল এই নাট্যাভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেছিল। বিশ্বরূপা কর্তৃপক্ষ এই নাটকের প্রযোজনায় প্রচুর অর্থব্যয় করেছিলেন। বহু জ্ঞানী-গুণী নাটক দেখে খুশী হয়েছিলেন।

শিশুসাহিত্য পরিষদের সভ্যবৃন্দ মাঝে মাঝে নাট্যাভিনয় করে দেশের ছেলে-মেয়েদের আনন্দ দেবার চেষ্টা করেছেন। যোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত ও কবি নরেন্দ্র দেবের অধিনায়কতায় এই নাট্যাভিনয়ের আয়োজন করা হত এবং বহু শিশু-সাহিত্যিক এই নাটকে অংশ গ্রহণ করতেন।

এই দেশের তিনটি শিশুকল্যাণ প্রতিষ্ঠান দীর্ঘদিন ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে ছোটদের জন্যে নানা ধরণের নাটক মঞ্চস্থ করে সারা ভারতের ছেলে-মেয়েদের প্রচুর আনন্দ ও শিক্ষা প্রদান করোছেন। এই প্রতিষ্ঠান তিনটির নাম হচ্ছে—

১। মণিমেলা ২। সব পেয়েছির আসর। ৩। শিশুরঙ্ মহল।

'মৌমাছির পরিচালনায় মণিমেলাই প্রতিষ্ঠানগতভাবে সর্ব্বপ্রথম ছোটদের নাটকের উন্নতি করে এগিয়ে আসে। বহুরসের নাটক বিভিন্ন মণিমেলা অভিনয় করে ছোটদের মধ্যে সাড়া জাগিয়ে তোলে। "শিশুরবি" নাটকে "মৌমাছি" বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। এছাড়া আরো অনেক নাটক তিনি রচনা করেন। 'সাজন-গাজনের" সৃষ্টি করে তিনি নানা ধরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন।

স্বপনবুড়োর পরিচালনায় "সব পেয়েছির আসর" শিশুনাটক নিয়ে বহুবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন। তার সংখ্যা নেহাৎ নগণ্য নয়। এছাড়া স্বপনবুড়ো প্রতি বছর সাহিত্যিকদের দিয়ে অভিনয়ের আয়োজন করে এক নতুন ধরণের চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেন। এই নাটকগুলি বিভিন্ন বৎসরে সাহিত্যিক-রাই রচনা করেছেন। তার ভেতর উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, মন্মথ রায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সুকমল দাসগুপ্ত, স্বপনবুড়ো, চিত্রিতা দেবী দিলীপ দাশগুপ্ত, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত প্রভৃতি।

স্বপনবুড়ো তাঁর একক চেষ্টায় বহু নাটক রচনা করেছেন। তার ভেতর উল্লেখযোগ্য নাটকগুলি হচ্ছে—রাণী কমলা, এশিয়ার নৃত্যছন্দ, স্বপনবুড়োর শিশুনাট্য (তিনভাগ) আত্মহত্যা, প্রতিশোধ, তালবেতাল, প্রথম পুরস্কার মায়াপুরী বাপ্পাদিত্য, মহাপূজা, শর্মিষ্ঠা দেবযানী, নাট্যে-প্রণাম, পাশাপাশি মহাভারতের মহাজাগরণ, ইন্দ্রজাল, ধরা ছোঁয়ার বাইরে, নিবেদিতা, কানাই বলাই, গগনে উদিল রবি, স্বর্গীয় সাহিত্য সমাবেশ।

সমর চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় শিশুরঙ্মহল ও বহু নাটক মঞ্চস্থ করেছেন। এই প্রতিষ্ঠান "অবন-মহল" তৈরী করে শিশুজগতে এক উল্লেখ যোগ্য কীর্ত্তি স্থাপন করেছেন।

শিশুরঙ্মহল আয়োজিত নাটকগুলির মধ্যে—মিঠুয়া, জিজো, সঙ্ অফ ইণ্ডিয়া, চড়ুইভাতি, নীল সাগরের নীচে, বুড়ো আংলা প্রভৃতি প্রচুর সুনাম অর্জন করেছে।

শিশুরঙ্মহল ছোটদের নাট্যাভিনয়ে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে থাকে। দৃশ্যপট, সাজসজ্জা ও সঙ্গীতের ব্যবস্থাপনায় তাদের কিছুমাত্র ত্রুটি নেই।

বহুকাল ধরে মহড়া দিতে পারে বলেই—তাদের নাটকগুলি অতি সহজেই দর্শকবৃন্দের মনোহরণ করে নেয়।

শিশুরঙমহল একটি নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা সুরু করেছেন। সেটি হচ্ছে—ছোটদের জন্যে পুতুল নাচ। এই প্রতিষ্ঠানের 'আলাদীন'—পুতুল তৈরীর কাজে সাজসজ্জা, দৃশ্যপটে এবং সর্বোপরি সুর সংযোজনায় বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছে।

এই পুতুল নাচের একক প্রচেষ্টায় যথাক্রমে শিল্পী শৈল চক্রবর্ত্তী এবং শিল্পী রঘুনাথ গোস্বামী উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। পুতুল নাচের ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক ভাবে তাদের কর্ম নৈপুণ্য প্রশংসার যোগ্য।

সম্প্রতি "পুতুল" নাম দিয়ে একদল নীরবকর্মী ও ছাত্র একট প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। শিল্পী গোপাল দে তাদের কর্ণধার। এই প্রতিষ্ঠনটিও কয়েকটি পালা তৈরী করে গুণীজন সমক্ষে প্রদর্শন করে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছে।

বেশ অনেক দিন আগে বিশ্বরূপা নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদ একটি শিশুনাট্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল। এই প্রতিযোগিতায় বহু বিদ্যালয় ও শিশু-প্রতিষ্ঠান যোগদান করে। বিচারকবৃন্দের বিচারে সব পেয়েছির আসরের নৃত্যনাট্য "কানাই বলাই" শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে পুরস্কৃত হয়।

শিশুনাট্য প্রযোজনা ও পরিচালনার কাজে ইদানিং এদেশের বিদ্যালয় গুলিও উল্লেখযোগ্য কাজ করে চলেছে। তার ভেতর বেথুন বিদ্যালয়, হোলি চাইল্ড, স্কটিশ চার্চ স্কুল, হেয়ার স্কুল, হিন্দু স্কুল এবং ডায়োসেশন স্কুল প্রভৃতির প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য। এছাড়া বহু শিশু প্রতিষ্ঠানও শিশুনাট্য সংগঠনের কাজে এগিয়ে আসছে।

আইনস্টাইনের জীবন ও কর্ম

ভাস্বতী লাহিড়ী

গোষ্পদ দিয়ে যেমন সাগরের জল মাপা যায় না তেমনি আমার মত সামান্য এক ছাত্রীর পক্ষে পৃথিবী শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইনের জীবন ও কর্মের আলোচনা তুচ্ছতায় পর্যবসিত হবে। সমগ্র ছাত্রসমাজের পক্ষ থেকে আমি বিশ্ববরেণ্য আইনস্টাইনকে আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

জার্মানীর উনাম্ শহরে জন্মেছিলেন এ যুগের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী আইনস্টাইন। তারিখটি ছিল ১৪ই মার্চ, ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দ। পরবর্তীকালে গণিতে যাঁর পারদর্শিতা ছিল অত্যাশ্চর্য, বিদ্যালয়ের আবদ্ধজীবন তাঁকে কোন দিনই উৎফুল্ল করেনি। কিন্তু পিতার সাহিত্যপ্রীতি, মাতার সঙ্গীতানুরাগ আর পিতৃব্যের গণিতপ্রিয়তা—সব মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল আইনস্টাইনের ভেতর। গণিতজ্ঞ আইনস্টাইন বেহালা ও পিয়ানোবাদনে ছিলেন সুদক্ষ; বাক্ ও বেটোফেনের সঙ্গীত ভালবাসতেন; গ্যেটে, শীলার, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের আস্বাদনে ছিলেন আগ্রহী। যাই হোক্, ১৯০০ সালে তিনি পলিটেকনিক অ্যাকাডেমী থেকে স্নাতক হলেন। জীবিকার তাড়নায় নিলেন চাকরী—আত্মনিয়োগ করলেন গণিত বিজ্ঞানের সাধনায়।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীর 'আন্নালেনডার ফিজিক' পত্রিকার একটি সংখ্যায় প্রকাশিত হ'ল তিনটি প্রবন্ধ—প্রথমটি ফটো-ইলেক্ট্রিক তত্ত্বের মীমাংসা, দ্বিতীয়টি ব্রাউনীয় বিচলন গতির ব্যাখ্যা এবং তৃতীয়টির দ্বারা তত্ত্বীয় পদার্থ-বিজ্ঞানের সর্বাপেক্ষা যুগান্তকারী ধারনা আপেক্ষিকবাদের আলোচনার সূত্রপাত ঘটানো।

সেদিন, যখন বিজ্ঞানীরা প্লাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্ব নিয়ে নীরব—যুবক আইনস্টাইন সেই তত্ত্বের চমৎকারিত্ব ঘোষণার সঙ্গে নতুন ব্যাখ্যা দিলেন প্রথম প্রবন্ধে।

ব্রাউনীয় তত্ত্বে গ্যাসের অণুরা সদাচঞ্চল এবং তা একটি পরীক্ষার সাহায্যে তিনি প্রমাণ করেন। গ্যাস অণুরা $Pr = \frac{1}{3} mnc^2$ এই সূত্র মেনে

চলে। এখানে, P=চাপ, r=আয়তন, m=গ্যাস অণুর ভর, n=গ্যাস অণুর সংখ্যা এবং C=গ্যাস অণুর গড়বেগ।

তৃতীয় প্রবন্ধ ইলেকট্রো ডাইনামিক্স অফ মুভিং বডিজ বা বিশেষ আপেক্ষবাদের ব্যাখ্যানুসারে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন ফেনার ওপরের বক্রতলটি। তবে এই তল দ্বিমাত্রিক নয়, চতুর্মাত্রিক এবং এখানে স্থান-কাল-সময় সবই আপেক্ষিক। ব্রহ্মাণ্ডটি তৈরী হয়েছে শূন্যস্থান এবং শূন্যসময় দিয়ে। আইনস্টাইনের এই ব্রহ্মাণ্ডে নেই কোনও সরলরেখার স্থান; আছে শুধু বিরাট বিরাট বৃত্ত।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আইনস্টাইন বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপনা করেন এবং কাইজার হ্বিলহেলম্ ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। শুরু হয় তাঁর দ্বিতীয় পর্যায়ের গবেষণা। ইথারের নতুন ব্যাখ্যা দিলেন— বস্তুর অবস্থিতিতে মহাকাশ নুয়ে পড়ে, বিকৃত হয়—জন্ম নেয় একটি ক্ষেত্র; বস্তুগুণ সম্পন্ন একটি মাধ্যম। অ্যালবার্ট একেই বললেন ইথার।

১৯১৪ থেকে ১৯১৬ অবধি গবেষণা করে প্রকাশ করলেন এক্সিসটেন্স অব গ্রাভিটেশন তত্ত্ব। এ সময় আর একটি সমীকরণ দ্বারা বিজ্ঞানের ইতিহাসে সূচিত করলেন এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। V বেগে ধাবমান বস্তুর ভর m, স্থিতাবস্থার ভর m_0, বেগজনিত বর্ধিতশক্তি E এবং আলোর বেগ c; তিনি সমীকরণ দিলেন $m=m_0+\frac{E}{c^2}$ এই হলো ভর ও শক্তির তুল্যতা।

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ আঘাত হানলো নিউটোনীয় ধারণার ওপর। তাঁর মতে বস্তুর অবস্থিতিতে সেইস্থান বক্রতাপ্রাপ্ত হয়। আপেক্ষিকতাবাদের একটি ফল, বেগ হলো আপেক্ষিক ও আলোর গতিই সর্বোচ্চ বেগ। আর একটি ফল ভর ও শক্তি মধ্যে সম্পর্কের আবিষ্কার। আইনস্টাইন বললেন, বস্তু শক্তিরই ঘণীভূত রূপ। শক্তি E, ভর m এবং আলোর বেগ c ধরলে সেই সম্পর্কটা হবে $E=mc^2$। তিনি আরও বললেন যে কোনো ক্ষেত্রের আলো পৃথিবীতে আসার পথে সূর্যের দিকে ১.৭ সেকেণ্ড কোন দিয়ে বেঁকে যায়। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণে তাঁর এই সূত্র প্রমাণিত হলো।

আইনস্টাইন প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্ব আরও সম্প্রসারিত করে বললেন কোনও শক্তি—আলো, তাপ, এক্স-রে সঞ্চালিত হয় তরঙ্গাকারে নয়, ভরহীন কণাগুচ্ছের পরস্পর বিচ্ছিন্ন ধারায়। আলোর শক্তিকণা ফোটন (যার শক্তি have) যখন কোনো ধাতব পাতের ওপর আপতিত হয়, তখন যে বেগে ঋণ আত্মক কণা ইলেকট্রন নির্গত হয়, আইনস্টাইন সে সম্বন্ধে তাঁর সমীকরণ দেন $hv = w + \frac{1}{2}mv^2$। কম্পাঙ্কের সঙ্গে গতিশক্তির লেখচিত্র আঁকলে তা হয় একটি সরল রেখা। এই তত্ত্বই তাঁকে ১৯২১ সালে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করে।

একীকৃত ক্ষেত্রতত্ত্ব বা ইউনিফায়েড ফিল্ড থিয়োরী তাঁর সাধনার শেষ সোপান। বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের সম্প্রসারণে যেমন সাধারণ অপেক্ষবাদ' তেমনি সাধারণ আপেক্ষবাদের সম্প্রসারণে একীকৃত ক্ষেত্রতত্ত্বে সম্পূর্ণরূপে পদার্থবিদ্যার মূলসূত্র পাওয়া যাবে। এটি কতদূর সফল তা বিচার করবেন ভবিষ্যতের বিজ্ঞানী সমাজ।

১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে নাৎসীদলন কালে তিনি চলে যান আমেরিকার প্রিন্সটনে। এই বিনয়ী, আত্মভোলা, শান্তিবাদী, পরোপকারী বিজ্ঞানী ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল চলে গেলেন আমাদের ছেড়ে আর দিয়ে গেলেন তাঁর জীবনভোর অনুসন্ধিৎসার চরম জ্ঞান। জগতে যে বিজ্ঞান মণীষী অনেকগুলি মৌল প্রশ্নের সুষ্ঠু গাণিতিক ব্যাখ্যা দিয়ে গেলেন, তিনি অ্যালবার্ট আইনস্টাইন —বিজ্ঞানী এবং ঋষি।

[পঃ বঃ সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত নেহরু যুব কেন্দ্র ও এন, সি, এম এবং বিড়লা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এণ্ড টেক্‌নোলজিকাল মিউজিয়াম কতৃক আয়োজিত ছাত্র-ছাত্রীদের বিজ্ঞান আলোচনা চক্র/১৯৭৮-এ হাওড়া জেলায় ১ম পুরস্কার প্রাপ্ত]

ভারতবর্ষের ভাষা সমস্যা

গোপাল ঘোষ

বহু ভাষাভাষীর দেশ এই ভারতবর্ষ। পৃথিবীর আর কোন দেশ পাওয়া যাবে না যেখানে এতগুলো ভাষাভাষীর লোক একই সংগে একই পরিবারের মত একই দেশের অধিবাসী। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন জাগে ভারতবর্ষে এতগুলো ভাষার সমন্বয় কি করে হল? একটু খুটিয়ে দেখলেই দেখা যাবে মূলতঃ সপ্তদশ-অস্টাদশ শতাব্দীতে উত্তর ভারত র্ষের সমৃদ্ধ ভাষা ছিল সংস্কৃত যার বেশ কিছু প্রভাব দক্ষিণ ভারতবর্ষেও ছিল। একাধিক মানুষ একই যায়গায় থাকলে তাদের মধ্যে যেমন মত পার্থক্য সম্ভব তেমনি ভাবেই স্থানীয় বা আঞ্চলিক ভাষা বলেও তখন কিছু ভাষা ছিল কিন্তু তার মূল ভাষা ছিল সংস্কৃতই। মনুষ্য সংখ্যা বৃদ্ধির কারণেই তাদের মধ্যে মত পার্থক্যের দরুন তারা বিভিন্ন ভাবে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। এবং যে আঞ্চলিক ভাষা যেখানে ছিল সেইগুলোকে অবলম্বন করেই স্থানীয় বা আঞ্চলিক ভাষার সৃষ্টি হয়। যেমন বাংলা. হিন্দী মৈথিলী, ভোজপুরী, তেলেগু, কান্নার প্রভৃতি। তার ভিন্নতা তত্ত্ব উত্তরভারতীয় ভাষার মধ্যে একটি সম্পর্কের সূত্র লক্ষ্য করা যায়। এবং প্রায় প্রত্যেক উত্তর ভারতীয় ভাষায়ই সংস্কৃতের আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। দক্ষিণ ভারতীয় ভাষা যদিও উত্তর ভারতীয় ভাষা থেকে আলাদা তবুও সেখানকার ভাষার মধ্যেও সংস্কৃত ভাষার প্রয়োগ দেখা যায়।

স্বাভাবিক ভাবেই এতগুলো ভাষীর দেশে রাষ্ট্র ভাষা নির্বাচন একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। তথাপি হিন্দী রাস্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকার করা হয়েছে যদিও অন্য ভাষী বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নানা প্রতিবাদ ওঠেছে। তাদের মতে আমার মাতৃভাষাকে কেন রাস্ট্র ভাষা মানা হবে না? নতুবা ইংরেজীকেই বা কেন রাষ্ট্র ভাষা মানা হবে না? প্রথমেই আমাদের স্মরণ থাকা উচিৎ আমাদের ভারতীয় সংবিধানে চৌদ্দটি ভাষকে স্বীকৃতি

দেওয়া হয়েছে সেই হিসাবে ইংরাজীর কোন স্থান নেই। মূলতঃ ইংরেজী হল বিদেশী ভাষা আমাদের ভাষা নয়। কোন দেশের বেশীর ভাগ লোক যে ভাষায় কথা বলে সেই ভাষাই রাষ্ট্র ভাষা হওয়া উচিৎ। আর সেই তত্ত্বকেই যদি মানতে হয় তাহলে হিন্দীকেই রাষ্ট্রভাষা বলে মেনে নেওয়া উচিৎ। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে ভারতবর্ষের শতকরা ৬০ ভাগ লোকই হিন্দী ভাষায় কথা বলে এবং বোঝে এবং যেহেতু উত্তর ভারতীয় সব ভাষার সাহিত্যেই একটা সামঞ্জস্য আছে সেইহেতু হিন্দী ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষা হিসাবে স্বীকার করার যথেস্ট যুক্তি রয়েছে। আর কোন ভারতীয় ভাষা নেই যে ভাষা ভারতবর্ষের এক চতুর্থাংশ লোক বোঝে বা কথা বলে। অনেকে হয়ত বলবেন হিন্দী সমৃদ্ধ ভাষা নয়। এ যুক্তি যে কতটা অযৌক্তিক সে যুক্তিতে পরে আসছি।

আমাদের দেশের মধ্যবৃত্ত পরিবারের বেশীর ভাগ লোক তাদের আয়ের এক বড় অংশকে ব্যয় করেন তাদের ছেলে মেয়েদের ইংরাজী শিক্ষার পিছনে, এটা তাদের একটা ফ্যাশন বা লোক দেখানো প্রতিযোগিতা। ঐ টাকাই যদি একটি ছাত্রের ভারতীয় ভাষা শিক্ষার পিছনে ব্যয় করা যায় তা হলে সেই ছাত্র অবশ্যই তার অনেক মেধার পরিচয় দিতে পারবে।

সন্দেহ নাই ইংরাজী একটি সমৃদ্ধ ভাষা। তার মূল কারণ ইংরেজরা এককালে সারা পৃথিবীর একছত্র অধিপতি ছিলেন এবং তার প্রসার ঘটাবার জন্য সর্ব্বপ্রকার যত্ন গ্রহন করেছেন। অন্ধ ইংরাজী বিশ্বাসীদের জেনে রাখা দরকার ইংলণ্ডে ইংরাজী প্রথমে রাষ্ট্রভাষা ছিল না। তাদের রাষ্ট্রভাষা ছিল ফ্রেঞ্চ। এবং ফ্রেঞ্চের পরিবর্তে যখন ইংরাজীকে রাষ্ট্রভাষা করা হয় তখনও ইংলণ্ডে অনুরূপ ইংরাজী ভাষা বিরোধী আন্দোলন হয়েছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেখানকার রাষ্ট্রভাষা ইংরাজী হতে বাধ্য হয়েছিল। কেননা অধিকাংশ ইংলণ্ডবাসীই ইংরাজী ভাষী। যার ফলে বিদেশী ভাষাকে ইংলণ্ড ছাড়তে হয়।

প্রকৃত পক্ষে ভারতীয়দের তাদের নিজস্ব দেশের ভাষা সম্বন্ধেই অজ্ঞ রাখা হয়েছে। আজ পর্য্যন্ত কতগুলো ভারতীয় গ্রন্থকে এক ভাষা থেকে রূপান্তর করে অন্য ভাষায় ছাত্রদের হাত দেওয়া হয়েছে? সেই তুলনায় ইংরাজী অনুবাদ আমরা বেশী পেয়েছি। যারা ভারতীয় অন্য ভাষা সম্বন্ধে

বিশেষ জ্ঞান রাখেন বা অন্য ভাষার গ্রন্থ পড়েন তারা নিশ্চয়ই এক বাক্যে হিন্দী কথা সাহিত্যিক প্রেম চাঁদের সাহিত্যিক পাণ্ডিত্যকে স্বীকার করে নেবেন। অতবড় কথা শিল্পী যাকে শরৎচন্দ্রের সাথে তুলনা করা হয়, যার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস গোদান, গবান, নির্মলা, সোজে বতন, সেবাসদন প্রভৃতি। ছোট গল্প হিসাবে কফন, পাঁচফুল সিরিজ, শতরঞ্জ কি খিলাড়ী, নমক কা দারোগা প্রভৃতি সমালোচকরা নিশ্চয়ই বলবেন না হিন্দী সাহিত্য দুর্বল। কিংবা কবি দিনকর যার বিখ্যাত কাব্য উর্বশী (জ্ঞানপীঠে পুরস্কার প্রাপ্ত) রশমী রথি কুরুক্ষেত্র ইত্যাদি বা হরিবংশ রায় বাচ্চন সিনেমা শিল্পী অমিতাভ বচ্চনের পিতা) যার কাব্য মধুশালা বা সুমিত্রা নন্দন পথ যার কাব্য কাদম্বরী (জ্ঞানপীট পুরস্কার প্রাপ্ত) তামিল লেখক অকিলন্দন যিনি চিত্তির পাওইয়া খ্যাত। এদের কারো সহিত্যেই দুর্বলতার পরিচয় পাওয়া যায় না বরং খুবই উচু মানের কিন্তু এর কতগুলো আজ বাঙালী ছাত্র সম্প্রদায় জানে বা তাদের পড়ানো হয়েছে যার ফলে অন্ধের মত আমরা অন্যএকটা ভাষাকে দুর্বল বলে বিদেশী একটা ভাষাকে আমাদের শিক্ষার মাধ্যম করতে এতটুকু লজ্জা বোধ করিনা।

যারা এই নির্লজ্যের দলে তাদের যুক্তি আমাদের আঞ্চলিক ভাষায় ভাল বই পাওয়া যায় না। আমার প্রশ্ন তাদের কাছে -তার জন্য কতটুকু চেষ্টা করা হয়েছে। যদি বাগানে ফুল গাছই না লাগানো হয় তবে ফুল কোথায় পাওয়া যাবে? নিশ্চয়ই বাজার থেকে কিনতে হবে সে ভাবে বেশী দিন চালানো যায় না। তাই আমাদের সেই ফুল গাছের চাষ আমাদের করতে হবে। অর্থাৎ প্রথম শিক্ষা লাভ আঞ্চলিক ভাষাই করতে হবে।

উচ্চ শিক্ষার জন্য কেউ যদি যদি ইংরাজী পড়তে চান বা শিখতে চান তবে তাকে বাধা দেওয়ার পক্ষপাতী আমি নই। তবে আমার ধারনা যে শ্রম ইংরাজীর পিছনে দিয়ে যে লাভ পাওয়া যাবে সেই শ্রম স্থানীয় ভাষা বা ভারতীয় ভাষার উপর দিলে তবে দ্বিগুন বা তিনগুণ ফল পাওয়া যাবে।

হিন্দী যদি আমাদের বিভিন্ন ভাষীদের মাধ্যম হয় তবে আমাদের বাঁধা কোথায়? আমরা গ্রাজুয়েট হয়েও কতটা ইংরাজীতে ভাব প্রকাশ করতে পারি বা অন্য ভারতীয়দের সাথে মিশতে পারি সেই হিসাবে সামান্য

হিন্দী শিক্ষা নিলেই হিন্দীর মাধ্যমে প্রায় ভারতের সমস্ত প্রান্তের সাথে যোগাযোগ করা যায় বা ভাব প্রকাশ করা যায়। তাই আমার মতে প্রত্যেক অঞ্চলের বা রাজ্যের উচিৎ নিজেদের স্থানীয় ভাষাকে প্রথম ভাষা হিন্দীকে দ্বিতীয় ভাষা ও ইংরাজীকে তৃতীয় ভাষা হিসাবে মেনে নেওয়া। তাতে আমাদের ভারতীয় ভাষারই মান বৃদ্ধি হবে। বাইরের ভাষার উপর নির্ভর হতে হবে না। আর তার ফলে ভারতীয়দের মধ্যে সৌহার্দ বেড়েই চলবে। কেন না বাড়তে বাধা।
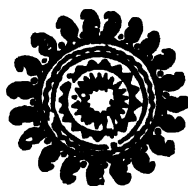
"মহাকাল সিংহাসনে
সমাসীন বিচারক, শক্তি দাও, শক্তি দাও মোরে,
কণ্ঠে মোর আনো ভজ্রবাণী, শিশুঘাতী নারীঘাতী
কুৎসিত বীভৎসা—'পরে ধিককার' হানিতে পারি যেন—

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রালোকে শিক্ষা

পরিমল দাশমুন্সি

স্বাধীনতা উত্তর যুগে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে বিস্তর আলোচনা ও বিবিধ কমিটী, কমিশন ইত্যাদি গঠিত হয়েছে। দেশে স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু দেশের শিক্ষার মূল যে লক্ষ্য অর্থাৎ শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দেশের সামগ্রিক উন্নতি বৃদ্ধির কোন লক্ষণই পরিলক্ষিত হচ্ছে না। অতএব; অস্বীকার করার উপায় নেই যে শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যেই কোথাও কোন গলদ আছে, কিন্তু বর্তমান শিক্ষাবিদগণ সেই গলদ কি ও কোথাও ঠিক ধরতে পারছেন না। এমতাবস্থায় বিশ্ববরেণ্য শিক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা সম্পর্কিত উক্তি, উদ্ধৃতি ও উপদেশ সমূহ আমাদের আলোকবর্তিকার মত অন্ধকারে পথ দেখাতে সহায়ক হতে পারে।

শিশুরাই দেশের ভবিষ্যত। আজকের শিশু আগামী দিনের নাগরিক। তাই শিশুশিক্ষার উপর রবীন্দ্রনাথ একাধিক প্রবন্ধ রচনা করে গেছেন। শিশুদের বুদ্ধিবৃত্তি এবং প্রতিভাকে তিনি কখনও ছোট মনে করতেন না পরন্তু তিনি বিশ্বাস করতেন 'বীজ যেমন মাটীর নীচে বেশ কিছুদিন লোক চক্ষুর অন্তরাল থেকে ভিতরে ভিতরে নিজের ভবিষ্যতের বিরাট সম্ভাবনাকে পুষ্ট করতে থাকে শিশুচিত্তেও সেই রকম অনেক গভীর ভাব ও গূঢ় তত্ব তাদের অবচেতন মনে সক্রিয় হয়ে ওঠে।' রবীন্দ্রনাথ তাঁর শান্তিনিকেতনে সভা সমিতি কিংবা উৎসব উপলক্ষ্যে আর দশজনের মত শিশু ও বালকদিগের উপস্থিতিও সাগ্রহে লক্ষ্য করতেন। ক্লাসে অল্প বয়স্ক ছাত্র ছাত্রীর কাছে তিনি এমন সব আলোচনা করতেন যেন শ্রোতার দল সকলেই চিন্তাশীল ও বিদ্বান। শিশুদের প্রধানতঃ প্রকৃতিদত্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করাই ছিল তাঁর একান্ত ইচ্ছা। এই প্রসঙ্গে সুধাকান্তবাবুর কাছে লেখা রবীন্দ্রনাথের একখানি পত্রাংশের একটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি লিখেছেন—'আমার এই ছেলেরা আকাশের আলোর সঙ্গে তাদের হাসি মেলাতে জানে এবং নববর্ষের সঙ্গে যেন তারা হৃদয়ের সুর মিলিয়ে মেঘ মল্লারে নেচে উঠ্‌তে পারে।'

শিশু শিক্ষার পরই গুরুদেব স্ত্রী-শিক্ষার উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। 'পুরুষ জাতির সেবা করার জন্য স্ত্রী জাতির জন্ম' প্রচলিত এই ধারণাকে তিনি আন্তরিক ভাবে ঘৃণা করতেন। এ সম্পর্কে তাঁর অভিমত হচ্ছে, "এতদিনের মানব ইতিহাসে যদি এই কথাই সর্বদেশে সপ্রমাণ হইয়া থাকে যে দাসীত্ব মেয়েদের স্বাভাবিক, তবে পৃথিবীর সেই অর্দ্ধেক মানুষের লজ্জায় সমস্ত পৃথিবী আজ মুখ তুলিতে পারিত না।" স্ত্রী শিক্ষার অবমাননার প্রতিবাদে দেশের শিক্ষাবিদদের নিকট তিনি প্রশ্ন রেখেছেন, 'বিদ্যা যদি মনুষ্যত্ব লাভের উপায় হয় এবং বিদ্যা লাভে যদি মানব মাত্রেরই সহজাত অধিকার থাকে তবে নারীকে কোন নীতির দোহাই দিয়া সে অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যায়?' প্রচলিত নারী শিক্ষার গতি প্রকৃতি লক্ষ্য করে তিনি অন্যত্র বলেছেন, 'পুরুষ যে স্ত্রী শিক্ষার ছাঁচ গড়িয়াছে সেটা পুরুষের ছাঁচ। শিক্ষাক্ষেত্রে স্ত্রী পুরুষে সমান অধিকার স্বীকার করেও রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, 'শিক্ষা প্রণালীতে মেয়ে পুরুষে কোথাও কোন ভেদ থাকিবে না, একথা বলিলে বিধাতাকেই অমান্য করা হয়। মেয়েদের শরীরের এবং মনের প্রকৃতি পুরুষের হইতে স্বতন্ত্র বলিয়াই তাহাদের ব্যবহারের ক্ষেত্র স্বভাবতঃই স্বতন্ত্র হইয়াছে।' স্ত্রী পুরুষের শিক্ষা প্রণালী ভিন্নতর অর্থে তিনি কিন্তু স্ত্রী শিক্ষাকে কিংবা স্ত্রী জাতির শিক্ষাপ্রণালীকে কোন অংশে পুরুষের শিক্ষা প্রণালী অপেক্ষা ছোট বলে ভাবতেন না। গুরুদেব বলতেন, 'মেয়েদের মানুষ হইতে শিখাইবার জন্য বিশুদ্ধ জ্ঞানের শিক্ষা চাই ; কিন্তু সর্বোপরি মেয়েদের মেয়ে হইতে শিখাইবার জন্য যে ব্যবহারিক শিক্ষা তার একটা বিশেষত্ব আছে—এইটাই তাদের সর্বাগ্রে শিখিতে হইবে।'

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা ব্যবস্থায় শিল্পকলার স্থান ছিল অনেক উচ্চে। আমাদের দেশের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় বিদ্যাশিক্ষার মধ্যে কলা বিদ্যার কোন স্থান নেই। রবীন্দ্রনাথ দুঃখ করে বলেছেন, 'এ দেশে আনন্দকে বিজ্ঞলোক ভয় করে এবং কলা বিদ্যাকে কাজের বিঘ্নকর মনে করে।' কিন্তু এই ধারণা যে আদৌ সম্পূর্ণ ভুল তা প্রমাণ করার জন্য তিনি জাপানীদের সঙ্গে ভারতীয়দের তুলনা করে বলেছেন 'জাপানীরা কাজ করিতে নিরলস, প্রাণ দিতে নির্ভীক ; কিন্তু চেরী ফুল ফোটার সৌন্দর্য সম্ভোগ লইয়া দেশের ছেলেবুড়ো সকলেই উৎসব করে। চিত্রকলার পরম মূল্য বোঝে না এমন মূঢ় সে দেশে কেহ নাই।'

শিক্ষা প্রনালীর মধ্যে এমন ব্যবস্থা থাকা চাই যা মানুষকে বাঁচা ও

বুদ্ধির ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী ও স্বনির্ভর হবার পক্ষে সহায়ক হয়। গুরুদেব তাঁর প্রবর্ত্তিত শিক্ষা ব্যবস্থায় এদিকেও বিশেষ লক্ষ্য রেখেছিলেন। তিনি জানতেন সমাজে দুস্কৃতকারী ও অসামাজিক লোক থাকবেই। শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যেই এইসব দুস্কৃতকারীর কবল থেকে আত্মরক্ষার সাহস ও কৌশল শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। তিনি তাঁর জমিদারী থেকে ভাল ভাল লেঠেল এবং জাপান থেকে বহু অর্থ ব্যয়ে জুজুৎসুর কুশলী শিক্ষক আনিয়ে ছাত্রদের লাঠিখেলা ও জুজুৎসু ব্যায়ামের শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। এছাড়া পুলিনদাসের পরিচালনায় ছাত্রদের ড্যাগার ও ছুরি খেলাও শেখান হত সেখানে। ছাত্রদের ভয়হীনতার চর্চার জন্য মাঝে মাঝে গভীর রাতে অন্ধকারের মধ্যে কোন শ্মশানে কিংবা কবরখানায় যেতে হত। এই উদ্দেশ্যে তিনি অভয়ব্রতী নামে একটি গোপন দল গঠন করেছিলেন।

স্কুল কলেজের শিক্ষা অপেক্ষা লাইব্রেরী বা গ্রন্থাগারের মাধ্যমে স্বেচ্ছায় ও স্বচ্ছন্দ চিত্তে সুশিক্ষিত হবার ব্যবস্থাকে রবীন্দ্রনাথ বেশী পছন্দ করতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন গ্রন্থাগার মানুষের জ্ঞান সংগ্রহের সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ক্ষেত্র। গ্রন্থাগারের গুরুত্ব বর্ণনা প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য, "এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, মানবাত্মার অমর আলোক কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে।" শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যম হিসাবে গ্রন্থাগারকে তিনি কত উচ্চস্থান দিতেন তাঁর এই মন্তব্য থেকেই তা সুস্পষ্ট বোঝা যায়। ইংরাজী শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর মতে ইংরাজী শিক্ষা আমাদের মানসিক শক্তিকে হ্রাস করে। 'ইহা প্রচুর সংগ্রহ করিতে শিখায়, কিন্তু নির্মাণ করিতে শিখায় না।' আমাদের শিক্ষা জীবন ও ব্যবহারিক জীবনের যে অসামঞ্জস্য ও বিচ্ছেদ দেখা যায় তার কারণ স্বরূপ তিনি বলেছেন, 'শিক্ষার বাহনটি আমরা অদ্যবধি পাই নাই। যথাযোগ্য বাহনের অভাবেই আমরা বাস্তব জীবনে পঙ্গু হইয়া পড়িতেছি।'

শিক্ষা ক্ষেত্রে দারিদ্রের যে অপরিসীম প্রভাব রবীন্দ্রনাথের সংবেদনশীল দৃষ্টি সেদিকেও সজাগ ছিল। এ সম্পর্কে তাঁর উক্তি, 'আমাদের দেশে বিদ্যা অভাবের অনুচর। ইংরাজী শিখিলে চাকুরী হইবে বা রাজ সম্মানের সুযোগ ঘটিবে দরিদ্রের এই মনোরথ আমাদের দেশে বিদ্যাকে চালনা করিতেছে।' দারিদ্রের এই প্রভাব শান্তিনিকেতনে পরিলক্ষিত হয়েছে। ছাত্রদের সঙ্গে নিবিড়ভাবে

মেলামেশার ফলে তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যতদিন নীচের ক্লাসে পড়ে ততদিন ছাত্রদের গান গাওয়া বা ছবি আঁকা শেখানো শক্ত হয় না। উপরের ক্লাসে উঠিবামাত্র আমাদের দেশের শিক্ষার লক্ষ্য ছাত্ররা বুঝতে শেখে এবং এই সমস্ত শিক্ষার বিরুদ্ধে তাদের মন বিদ্রোহ করে। সমাজের কাছে যে শিক্ষার স্বীকৃতি নাই একটু বয়স হলেই ছাত্রদের মনেও সেই শিক্ষার প্রতি অনীহা জন্মানই স্বাভাবিক।

প্রকৃত শিক্ষার স্বরূপ বিশ্লেষণ করে শিক্ষাচার্য্যের অভিমত 'কেবল ইন্দ্রিয়ের শিক্ষা নয়, কেবল জ্ঞানের শিক্ষা নয়, বোধের শিক্ষাকেই আমাদের বিদ্যালয়ে প্রধান স্থান দিতে হবে। অর্থাৎ কেবল কারখানার দক্ষতা শিক্ষা নয়, স্কুল কলেজে পরীক্ষায় পাশ করা নয়, আমাদের যথার্থ শিক্ষা তপোবনে প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হয়ে, তপস্যা দ্বারা পবিত্র হয়ে, এই জন্যে ব্রহ্মচর্যের সংযম দ্বারা বোধশক্তিকে বাধামুক্ত করার শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক।' এবং বিদ্যালাভের আদর্শস্থান বলতে গুরুদেবের অভিমত "যেখানে সাধনা চলছে, যেখানে জীবনযাত্রা সরল ও নির্মল, যেখানে সামাজিক সংস্কারের সংকীর্ণতা নেই, সেখানে ব্যক্তিগত জাতিগত বিরোধবুদ্ধিকে দমন করার চেষ্টা আছে—সেইখানেই ভারতবর্ষ যাকে বিশেষভাবে 'বিদ্যা' বলেছে তাই লাভ করবার স্থান।"

কুম্ভমেলার ইতিহাস

[একটি পৌরানিক কথা-কাহিনী]

সত্যেন বিশ্বাস

যুদ্ধ চলছিল অনেকদিন ধরেই। প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য লড়াই। অস্তিত্ব বজায় রাখার লড়াই। অমরত্ব লাভের জন্য লড়াই। বিবাদমান গোষ্ঠী হল দেবতা ও অসুর। একসময় লড়াইয়ের সাময়িক বিরতি ঘোষণা হল। কারণ অমৃতের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে সমুদ্রের নীচে। নিজেদের স্বার্থেই লড়াই বন্ধ রেখে এখন সমুদ্র মন্থন করতে হবে, যেসে কথা নয়-অমৃত পান করে অমরত্ব লাভ। আর অমরত্ব লাভ মানেই চিরস্থায়ী প্রতিষ্ঠা। বিপদ দেখা দিল অমৃত তোলা নিয়ে—কারণ তা রয়েছে সমুদ্রের নীচে। দেবতা আর অসুররা বসে গেলেন বিশ্বের সর্ব্ব প্রথম পরিকল্পনা রচনায়। পরিকল্পনা রূপ পেল। সঙ্গে থাকল নানা রকমের চুক্তি ও শর্ত। পরবর্তী কালে অবশ্য দেবতারা নানা অজুহাতে ঐ চুক্তি ভঙ্গ করে পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে তোলেন। যাক সে সব কথা। বহু উপরোধ আর অনুরোধের পর বিষ্ণু রাজি হলেন "কূর্ম" হতে। নাগরাজ বাসুকিকে হতে হল "রজ্জু"। কূর্মরূপি বিষ্ণুর পিঠে স্থাপিত হল মন্দার পর্ব্বত। রজ্জুরূপি বাসুকি বেষ্টন করল সেই পর্ব্বতকে। শুরু হল মন্থন।

সাপের মুখে বিষ—সুতরাং মুখের দিকে ধরে কে টানবে এই নিয়ে প্রাথমিক এক বিবাদ সৃষ্টি হল। অবশেষে দেবতারা নানা ফন্দি ফিকির করে অসুরদের বাধ্য করলেন রজ্জুর মুখের দিকে যেতে। দেবতারা নিলেন লেজের দিক ধরে টানার দায়িত্ব।

একটা শুভক্ষণ দেখে শুরু হল মন্থনের কাজ। প্রথমে সমুদ্রের বুক চিরে উঠে এলেন লক্ষ্মী। লক্ষীর রূপ দেখে সকলেরই মাথা ঘুরে গেল। দেবসুরা দাবী রাখলেন প্রথম মন্থনের ফলটি। বিষ্ণু বল্লেন ইনি আমার মতই ব্রহ্মরূপিনী পরমা-শক্তি, অতএব ভাগের প্রশ্নই ওঠেনা। লক্ষ্মীকে কুক্ষিগত করলেন দেবতারা। তারপর উঠলেন উর্ব্বশী। অসুররা উর্ব্বশীর উপর জোরালো দাবী রাখলেন। ভয়ানক চটে গেলেন দেবরাজ ইন্দ্র। প্রথম ফলটি তাকে উৎসর্গ করা হয়নি—অতএব দ্বিতীয়টি তিনি কিছুতেই ছাড়বেন না। উর্ব্বশীকে সভা-সুন্দরী হিসাবে দেবতারা বেছে নিলেন। তৃতীয় বারে উঠল "ঐরাবত"। ইন্দ্রকে প্রথম ফলটি

উপহার দেওয়া হয়নি—অবশ্য দ্বিতীয়টি দেওয়া হয়েছে কিন্তু তার খেসারত হিসাবে তৃতীয়টিকেও তিনি হস্তগত করতে চান। ইন্দ্রের রাগ কমানোর জন্য "ঐরাবত"কেও দেওয়া হল উপহার হিসাবে। এর পর উঠল "পারিজাত"। অসুররা এবার মরিয়া হয়ে দাবী রাখলেন পারিজাতের উপর। দেবতারা একবাক্যে গর্জ্জন করে উঠলেন। পারিজাত স্বর্গের নন্দন কাননের জন্য। অসুরদের এমন বাগান আছে কি যেখানে পারিজাত শোভিত হতে পারে? এই রকম নানা যুক্তি ও কৌশল অবলম্বন করে দেবতারা একে একে সমস্ত উত্থিত দ্রব্যই কুক্ষিগত করতে লাগলেন। অসুররা কেবল খেটেই মরছে ওদের ভাগ্যে কিছুই জুট্‌ছে না। মধ্যে মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দিচ্ছে বটে কিন্তু দেবতারা ওদের আশার কথা শুনিয়ে নানা অমূলক আপ্তবাক্য বলে ঠাণ্ডা রাখছেন। এই ভাবে মোট এয়োদশ দ্রব্য পর্যন্ত দেবতারা তাদের ছল চাতুরি চালিয়ে গেলেন। চতুর্দশবারের মাথায় গিয়ে উঠল অমৃত। যে অমৃতের জন্য সবাই অপেক্ষা করছিল। পূর্ণ কুম্ভ হাতে নিয়ে উঠে এলেন "ধন্বন্তরি"। এক কলসি অমৃতের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল অসুরেরা। এতক্ষণ তারা যা হউক বিদ্রোহী হয়নি। আর তারা মুখ বুজে দেবতাদের আর্জি মেনে নেবেনা। দেবতারাও অবশ্য প্রখর দৃষ্টি রাখছিলেন। সব থেকে তৎপর ছিলেন ইন্দ্রের পুত্র "জয়ন্ত"। প্রচণ্ড হৈ হট্টগোল আর ধাকাধাক্কির মধ্যে হঠাৎ "জয়ন্ত" অমৃতের কলসিটা নিয়ে ছুট। তাকে ধরবার জন্য অসুররা তার পেছনে পেছনে ছুটলেন। অন্যান্য দেবতারাও নানা গুপ্ত পথ ও ঘুরপথে গিয়ে জয়ন্তের সহযোগী হলেন। ১২ দিন ধরে চলল এই অমৃত রক্ষার লুকোচুরির খেলা। অমরত্ব লাভের আশয় এরই মধ্যে চলছিল মারামারি। একদল দেবতা অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধে-লিপ্ত—অন্যদল ব্যস্ত অমৃতকুম্ভ রক্ষার খেলায়। রিলে প্রথায় দৌড়ে দেবতারা একে অন্যের সাহায্যে কলসিটাকে লুকিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে অবশেষে অসুরদের পরাজিত করে দেবতারা "অমৃত কুম্ভ" নিজেদের দখলে রাখতে সমর্থ হলেন। অসুররা শেষ পর্যন্ত সমুদ্র "মন্থন" করে প্রহাব আর ছলনা ছাড়া কিছুই পাননি। দেবতাদের ১২ দিন হলো পৃথিবীর ১২ বৎসর। অসুরদের পরাজিত করবার পর দেবতারা চেটেপুটে অমৃত খেতে লাগলেন। এরই মধ্যে কিন্তু একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। অমৃত কুম্ভ নিয়ে দৌড়াদৌড়ি ও কাড়া-কাড়ির সময় মাত্র ৭ ফোঁটা অমৃত ভারতের ৪টি জায়গায় পড়ে যায়। এই চারটি যায়গা হল (১) হরিদ্বার (২) প্রয়াগ (৩) নাসিক ও (৪) উজ্জয়িণী। আর এই চার জায়গাতেই ১২ বৎসর পর পর কুম্ভ যোগ পর্ব্ব অনুষ্ঠিত হয়। মর্ত্ত্যের মানুষ এই যোগ উপলক্ষে স্নান করে পুণ্য সঞ্চয় করে। ১৯৮২ সালে ভারতে আবার উপস্থিত হবে "কুম্ভযোগ"।

নতুন সূর্য্য

শক্তিব্রত মুখোপাধ্যায়

অস্থিরভাবে সারা ঘরে পায়চারি করছেন ডাঃ ঘোষাল। ডাঃ অনিরুদ্ধ ঘোষাল, বি, এস, সি ; এম, বি, বি, এস। পেছনে মুষ্টিবদ্ধ দু'টি হাত রেখে সামনের দিকে মাথা কিছুটা ঝুঁকে নত দৃষ্টিতে পায়চারী করে চলছেন সেই সন্ধে থেকে। মাঝে একটু থামছেন শুধু মাত্র লাইটারের সাহায্যে সিগারেটে অগ্নি সংযোগের জন্য। সারাঘর আধ পোড়া সিগারেট ও ছাই-এ ভর্ত্তি। ঘরের জিনিসপত্র সব অগোছাল অবস্থায় রয়েছে। অদূরে একটা সোফায় স্ত্রী অলকা প্রস্তরবত বসে। চোখের জলে শাড়ীর একাংশ ভিজে গেছে। চোখের কোল দুটি কান্নায় ফোলা। প্রচণ্ড আঘাতে তিনিও যেন মূক হয়ে গেছেন। কে কাকে সান্ত্বনা দেবে ? পাশের ঘরে একমাত্র মেয়ে সোমাও বালিশে মুখ গুঁজে পড়ে আছে। গুমড়ে গুমড়ে কান্নায় ফুলে ফুলে উঠছে তার দেহ। এই মুহূর্ত্তে বেহালার চৌরাস্তার উপর এই দোতলা বাড়ীটাতে যেন বিরাজ করছে শ্মশানের নিস্তব্ধতা। কাজের লোক কমলা একবার উপরে এসে মনিবদের এই অবস্থা দেখে আবার নীচে ফিরে গেছে। সকালবেলা সোমাদিদিকে নিয়ে বাবু আর মা গাড়ী নিয়ে কোথায় যেন গিয়েছিল। সন্ধ্যেবেলা ফিরে আসার পর কারও কোন সাড়া শব্দ পাচ্ছে না। একটা অসহনীয় ব্যাপার যে ঘটেছে কমলা তার স্বল্প বুদ্ধিতেই তা বুঝেছে। দূরের পেটা ঘড়ীটায় ঢং ঢং করে রাত দশটা বাজল। রাত গভীর হতে শুরু করল।

ডাঃ ঘোষাল বোধহয় একটু ক্লান্ত হয়ে বসে পড়লেন। বজ্রমুঠিতে মাথার চুলগুলি খামচে ধরলেন, বোধহয় ছিড়েই ফেলবেন। পরক্ষণেই হাত আলগা করে নামিয়ে রাখলেন। একটা কান্না যেন দলা পাকিয়ে বুকে আটকে আছে। কিছুতেই উঠে আসছে না। ওঃ, তিনি বোধহয় পাগল হয়ে যাবেন। একটু কাঁদতে পারলেও বোধহয় কিছুটা হালকা হতে পারতেন। চোখের জলে নাকি মনের কালিমা কিছুটা ধুয়ে যায়। তাঁর মনে হ'লো সমস্ত পৃথিবীটাই তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছে। এমনকি তাঁরই আত্মজা তাঁর প্রাণাধিক কন্যা সোমাও এই দলে। না হলে সোমার জন্য এই কলঙ্কের বোঝা তাঁর মাথায় চাপত না।

আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা পরে সারা শহর জুড়ে ঘোষাল পরিবারের কলঙ্কের ঢাক বেজে উঠবে। প্রভাতী সংবাদপত্রগুলো ফলাও করে ছাপবে কেচ্ছা-কাহিনী। অথচ তাঁর এই ৪৫ বছরের গৌরবময় জীবনে এ রকম একটা কলঙ্কের অধ্যায় নেমে আসবে এ তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নি। অথচ এই সোমাকে ঘিরে কত স্বপ্নই না দেখেছেন। সোমাকে নিজের মনের মত করে গড়ে তুলবেন, সে তার মত নামী ডাক্তার হবে, আর্তের সেবায় আত্মনিয়োগ করবে। এযে তাঁর অনেক দিনের স্বপ্ন, অনেক দিনের আশা। কিন্তু সোমা সব আশা সব স্বপ্ন মিথ্যে করে দিল। সে ডাক্তার না হয়ে কলঙ্কিনী হল। কিন্তু সব দোষ কি শুধু সোমার? তিনি নিজে কি একটুও এ ব্যাপারে দায়ী নন? তিনি যদি একটু দূরদর্শী হতেন, যদি প্রণবের প্রস্তাবে রাজী হয়ে যেতেন তা হলে সোমাও আজ সুখী হতো। আর তাঁর উঁচু মাথা উচুতেই থাকতো। একমনে ভেবে চলেছেন ডাঃ ঘোষাল।

ডাক্তার অনিরুদ্ধ ঘোষাল বেহালা অঞ্চলের অতি সুপরিচিত একটি নাম। ডাক্তার হিসেবে যেমন তাঁর খ্যাতি, তেমনি পরোপকারী, সৎ এবং নিঃস্বার্থ সমাজসেবী হিসেবেও তাঁর খ্যাতি অনেক। বিভিন্ন প্রকার সংগঠনের সাথেও তিনি জড়িত। ডাক্তার হিসেবে সুখ্যাতির সাথে সাথে অর্থও এসেছে প্রচুর। প্রায় অভাবনীয়ভাবে। কিন্তু অহমিকা তাঁকে কোনও দিন স্পর্শ করতে পারে নি। তাঁর সেবাপরায়ণ মনোভাবই তাঁকে বড় হতে সাহায্যে করছে। রোগের উপসম শুধু মাত্র বড় বড় ওষুধেই হয় না। তার সাথে প্রয়োজন চিকিৎসকের সহানুভূতি ও সহৃদয় ব্যবহার, একথা তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন। ফলস্বরূপ পসারও তাই দিন দিন বেড়ে চলেছে। ডায়মণ্ডহারবার রোডের উপর 'SOMA CLINIC' ও 'SOMA NURSING HOME'ই তার বড় প্রমাণ। তাঁর এই অর্থ ও খ্যাতির মূলে স্ত্রী অলকার প্রেরণার কথা কখনও ভোলেন না। ছাত্রী অলকা বধূ হয়ে এসেই স্বামীর সকল কাজে শুধু প্রেরণা দিয়ে এসেছেন। আত্মসুখ না দেখে স্বামীকে বড় হতে একসময় বিয়েতে পাওয়া সকল অলঙ্কার তার হাতে তুলে দিয়েছিলেন। মাঝে মাঝে তাই ডাক্তারের মনে হয় সেইসব সোনালী দিনগুলির কথা। আজ এই মুহূর্তেও ফিরে গেলেন সেই দিন গুলিতে। অলকার গৃহশিক্ষক যখন নিযুক্ত হলেন তখন অলকা বি, এ চতুর্থ বর্ষের ছাত্রী। অনিরুদ্ধও মেডিক্যাল ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র। সারাদিন কঠোর পড়াশুনোর

মধ্যে থেকেও অলকার শিক্ষকতায় কখনও ফাঁকি দেন নি। যতটা সম্ভব নিজের বিদ্যাবুদ্ধি দিয়ে অলকাকে পরীক্ষার জন্য তৈরী করিয়েছিলেন। অবশ্য, ছাত্রী হিসেবে অলকারও সুনাম ছিল। উভয়েরই চেষ্টায় অলকা বি, এতে ভাল রেজাল্ট করল এবং সে বছরে অনিরুদ্ধ ও ডাক্তার হয়ে বেড়িয়ে এলেন। শিক্ষক-ছাত্রীর আনন্দ আর ধরেনা। অনিরুদ্ধ একদিন আবিষ্কার করলেন যে ছাত্রীকে শুধু বিদ্যাই দান করেন নি, তার সঙ্গে হৃদয়টাও দিয়ে বসে আছেন। ফলে একদিন অলকার অভিভাবকদের কাছে তাকে বিয়ের প্রস্তাব করে বসলেন। বলা বাহুল্য তাঁরা সম্মতিই দিয়েছিলেন। এ পাত্রের ভবিষ্যত যে উজ্জ্বল, সেটা তারা বুঝেছিলেন। তাঁদের ধারণা যে সঠিক ডাঃ ঘোষাল পরে তা প্রমাণ করেছেন। তিনি জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। তাই তাঁদের বড় আকাঙ্ক্ষা ছিল একমাত্র মেয়েকে মনের মত করে মানুষ করে তুলবেন। সোমা বাবার মত নামী ডাক্তার হয়ে সমাজে খ্যাতি অর্জন করবে। এই আশা নিয়ে তাঁরা ছোটবেলা থেকেই সোমার লেখাপড়ার ব্যাপারে কড়া নজর দিয়েছিলেন। সবচাইতে নামী স্কুলে ভর্ত্তি করিয়েছেন। প্রাইভেট টিউটর থাকা সত্ত্বেও ডাঃ ঘোষাল সময় করে নিজেই মেয়ের পড়াশুনা দেখতেন। ফলে সোমা প্রতিবছর ভাল রেজাল্ট করে উপরের ক্লাসে উঠেছে। কিন্তু ইদানিং ডাক্তার আর সময় পান না। চেম্বার, নারসিং হোম নিয়ে সারাদিন কেটে যায়। তার উপর আছে অন্যান্য সংগঠনের কাজ। অলকাও অভিযোগ করেন মেয়ের প্রতি যথেষ্ঠ নজর দেওয়া হচ্ছে না দেখে। ক্লাস নাইনের ছাত্রীকে মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য এখন থেকেই প্রস্তুত হতে হবে। ডাক্তার স্ত্রী কথার যৌক্তিকতা মেনে নিলেন। ভাল শিক্ষকের খোঁজে কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেন। অনেক প্রার্থীর থেকে বাছাই করে প্রণবকেই নির্বাচন করলেন। প্রণবের কথাবার্তা ডাঃ ঘোষালকে মুগ্ধ করেছিল। ভদ্র-বিনয়ী সৌম্য দর্শন এ ছেলেটির সাথে কথা বলে ডাক্তার জানলেন প্রণব বেহালারই ছেলে। বি, এস, সি-তে ভাল রেজাল্ট করে এম, এস, সি-তে ভর্ত্তি হয়েছে। মনে উচ্চাশা রাখে। পারিবারিক অবস্থা খুব স্বচ্ছল না হওয়ায় সে প্রাইভেট টিউসনি করে পড়ার খরচ মেটাতে চায়। ডাক্তার ও অলকা উভয়ে খুশী হয়ে প্রণবকেই সোমার গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করলেন। প্রণবও এদের সহৃদয় ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে সোমার শিক্ষকতায় যথাসাধ্য মনোযোগী হ'ল। নিয়মিত ভাবে উপস্থিত থেকে সোমাকে সাহায্য করছে। ফলে সোমা মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে ভালভাবে

উত্তীর্ণ হল। ঘোষাল পরিবার স্বভাবতঃই খুশী। খুশী প্রণবও। খুশীর জোয়ারে ভেসে গিয়ে সে হঠাৎ একদিন ডাক্তারের কাছে সোমাকে বিয়ের প্রস্তাব করে বসল। প্রস্তাব শুনে চমকে উঠেছিলেন ডাক্তার অনিরুদ্ধ ঘোষাল। প্রণবের কাছ থেকে এরকম প্রস্তাব যেন তাঁর কাছে অপ্রত্যাশিত ছিল। ~ায় পঁচিশ বছর আগে অভিনীত একটি নাটকের পুনরাভিনয় যেন ঘটে গেল তার সামনে। নাটকের ঘটনা বদল হয়নি, বদল হয়েছে শুধু কাল আর পাত্র। অনিরুদ্ধের চরিত্রে প্রণব অভিনয় করছে। সহ্য করতে পারলেন না ডাঃ ঘোষাল। প্রচণ্ড রেগে গিয়ে অপমান করে প্রণবকে তাড়িয়ে দিলেন। প্রণবকে জানালেন "ডাক্তারের মেয়ে ডাক্তারই হবে। হাতা-খুন্তি নিয়ে রান্নাঘরে যাবে না"। তা ছাড়া সে এখন এক কর্মহীন বেকার বাঙুলে ছাড়া কিছুই নয়। অপমানিত প্রণব নিঃশব্দে ঘর থেকে বেড়িয়ে গিয়েছিল। প্রণবের জায়গায় নিযুক্ত করেছিলেন এক বৃদ্ধ স্কুল শিক্ষককে। কিন্তু এত করেও সোমাকে অভীষ্ট পথে নিয়ে যাওয়া গেল না। সে ডাক্তাব না হয়ে কলঙ্কিনী হ'ল। এই ক্ষণে তাঁর মনে হল প্রণবকে না তাড়ালেই বোধহয় ভাল করতেন। কিন্তু এখন তো আর ভুল শোধরানো যাবে না। ভুলটাকেই মেনে নিতে হবে। কিন্তু যত ভাবনা সোমাকে নিয়ে। সোমা যদি আত্মহত্যা……না, আর ভাবা যাচ্ছেনা। ভাবনার শেষ নেই।

বড় আশা নিয়ে তিনি আজ কোর্টে বেড়িয়েছিলেন। সোমা, অলকাও সঙ্গে ছিল। আজ ছিল মামলার রায়ের দিন। ভারতীয় দণ্ডবিধের ৩০৮, ৩৬৬, ও ৩৬৮ ধারায় অভিযুক্ত দুলাল ও তার দুই সহকারী বিরুদ্ধে পর পর কয়েক দিন ধরে যে শুনানী হয়, আজ ছিল তার রায় দেওয়ার দিন। আসামী কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছে অভিযুক্ত দুলাল, আর তার কুকর্মের দুই সহকারী। এদিকে উভয় পক্ষেরই উকিলবাবুরা গভীর প্রতিক্ষায়। প্রতিক্ষার যেন শেষ নেই রায় শোনার জন্য কৌতুহল শ্রোতাদেরও। কাগজের রিপোটাররাও উপস্থিত রায়ের সারাংশ লিখে নিতে। পরপর কয়েকদিন ধরেই পরিবেশন করছে ডাক্তার পরিবারের মুখরোচক কেচ্ছা কাহিনী। আগামী কালের প্রভাতী সংবাদ পত্রে ফলাও করে ছাপাবে মোকদ্দমার রায়।

দায়রা জজ অমিত দত্ত গুপ্ত বিচারকের আসনে বসে অনুচ্চ গম্ভীর কণ্ঠে পড়ে গেলেন বহু পৃষ্ঠা ব্যাপী তাঁর দীর্ঘ রায়। গত কয়েকদিন ধরে উভয় পক্ষের সাক্ষীর জবান বন্দী ও দাখিলী কৃত প্রমাণ পত্রের উল্লেখ করে গঠন করেছেন

মোকদ্দমার রায়। সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন মূল ঘটনাবলী—। বিশেষ করে সোমার স্বীকারোক্তি। আসামী পক্ষের উকিলের তীক্ষ্ণ জেরার উত্তরে সোমা স্বীকার করেছে যে দুলালকে ভালবেসেই তার এই পরিণতি। প্রেমের ফল হিসেবে পেয়েছে এক অবৈধ শিশু সন্তান, হয়েছে কুমারী মা। জেরার উত্তরে সে বিবৃত করেছে সকল ঘটনা। মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হবার পর তার বাবা তাকে ভর্ত্তি করিয়ে দেন বরিশার বিবেকানন্দ কলেজে। কলেজে নিয়ে যাওয়া—আসার জন্য দায়িত্ব ছিল দুলালের উপর। নিরক্ষর শীর্ণকায় দুলাল তাঁর বাবার চেম্বারে কাজ করত। কম্পাউণ্ডারবাবুকে সাহায্য করা ছাড়া তাদের বাড়ীর ফাইফরমাসের কাজ সে করে দিত। তার চাইতে বয়সে সামান্য কিছু বড়, দুলালের দ্বারা কোন অনিষ্ট হতে পারে সে বা তার বাবা মা কখনও তা ভাবেননি। কিন্তু দুলালের সাথে নিত্য যাতায়াতের ফলে উভয়ের মধ্যে হৃদ্যতা জমে, কিছুটা দুর্বলতা দেখা দেয়। মাঝে মাঝে বাড়ী ফিরবার পথে সে দুলালের বাড়ীতে কিছুসময় কাটিয়ে আসত। কারণ দুলালের মা তাকে স্নেহ করতেন। একদিন দুলালের মা বাড়ী না থাকায় সে মতিচ্ছন্ন হয়ে দুলালের কুমতলবে সম্মতি জানায়।

এরপর আরো কয়েকদিন। যখন নিজের ভুল ভাঙলো। তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। এ রকম সম্ভাব্য পরিণতির কথা সে আগে কখনও ভেবে দেখে নি। তাই লজ্জায় প্রথমে কাউকে কিছু প্রকাশ করতে পারে নি। এমনকি তার মাকেও না। কিন্তু পরে বাধ্য হয়েই দুলালের কাছে গিয়ে তাকে এই আবস্থা থেকে উদ্ধার করতে বলে। দুলাল তাকে কয়েকটা দিন তার এক আত্মীয়ার বাড়াতে রাখে। ইতিমধ্যে কিছু একটা ব্যবস্থা করে ফেলবে বলে তাকে আশ্বাস দেয়। কয়েকদিন পর তার বাবা পুলিশ নিয়ে এসে তাকে উদ্ধার করেন। সোমাকে তার বাবা জানান যে দুলাল দলবল নিয়ে সোমার উদ্ধারপণ হিসেবে পনের হাজার টাকা দাবী করেছে। না দিলে ফল ভোগ করতে হবে আর সোমার কলঙ্কের কথা তারা রটিয়ে বেড়াবে যাতে সমাজে ঘোষাল পরিবারের সুনাম নষ্ট হয়।

কিন্তু ডাক্তার ঘোষাল তাতে ভয় না পেয়ে দুলাল ও তার সাথীদের বিরুদ্ধে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে নাবালিকা অপহরণের মামলা দায়ের করেছেন। সোমাও পরে তার বাবাকে সমর্থন করেছে। সোমা তার জবানবন্দীতে আরো স্বীকার

করেছে যে, মাস কয়েক আগে সে এক পুত্র সন্তানের জননী হয়েছে। শিশুটি বর্তমানে মাদার টেরেসার অনাথ আশ্রমে আছে।

জজসাহেব তাঁর দীর্ঘ রায় দানের উপসংহারে বলেন যে এই মামলার তদন্তে পুলিশের ব্যর্থতা তাঁর নজরে বড় বেশী পড়েছে। এমনকি F. I. R-ও যথাযত তৈরী হয় নি। শুধু তাই নয় সোমার পক্ষ থেকে তাকে নাবালিকা প্রমানেও ব্যর্থ হয়েছে। কোনও Birth Registration certificate দাখিল করা হয় নি। অপর দিকে Radiologist এর পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে ঘটনার সময় সোমার বয়স আঠার বছরের উর্দ্ধে ছিল এবং আসামীর উদ্দেশ্যে লেখা সোমার চিঠিপত্র থেকে জানা যায় যে তার প্রতি সোমার আসক্তি যথেষ্ট ছিল। অতএব দুলালের কুকাজ সোমার সম্মতিতেই সাধিত হয়েছে। সুতরাং দুলাল ও তার সঙ্গীদের বিরুদ্ধে নাবালিকা অপহরণের মামলা আদৌ টেঁকে না। তারা নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ায় বেকাসুর খাসাস।

রায় শুনে বসে পড়েছিলেন ডাক্তার ঘোষাল। অজস্র ব্যঙ্গ বিদ্রুপের তীক্ষ্ণ বাণ এসে বিঁধতে লাগল তাঁদের উপর। কি করে যে সোমা ও অলকাকে নিয়ে কোর্ট থেকে বেড়িয়ে গাড়ী ড্রাইভ করে বাড়ী ফিরছেন সে কেবল ঈশ্বরই জানেন।

দূরের পেটা ঘড়ীটা জানিয়ে দিল রাত বারোটা বাজে। রাতের কোলকাতায় সবাই যখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন তখন ঘুম নেই শুধু এই বাড়ীটাতে। সন্ধ্যে ছ'টায় যে চিত্র দেখা গেছে এখন রাত রারোটাতেও সেই চিত্র বদলায় নি। কিছুতেই নিজেকে শান্ত করতে পারছেন না ডাঃ ঘোষাল। রাত যত বাড়ছে, ততই তিনি অস্থির হয়ে পড়ছেন।

আর মাত্র কয়েকঘণ্টা পরে রাত্রির অবসানে যে সূর্য্য উঠবে, সে কি কেবল ঘোষাল পরিবারের কলঙ্ক প্রকাশের জন্য। অসম্ভব। যদি ক্ষমতা থাকতো এই রাতটাকে তিনি অনন্ত রাত্রিঃবলে ঘোষণা করতেন। কিছুতেই সূর্যোদয় হতে দিতেন না।

কিন্তু রাততো থেমে নেই। দূরের ঘড়ীটা তা বারবারই জানিয়ে দিচ্ছে। একটা— দুটো—তিনটে চারটে····।

সকাল ঠিক সাতটা। ঘোষাল বাড়ীর সামনে এসে থামল একটা ট্যাক্সি। ভাড়া মিটিয়ে নেমে এল এক যুবক। বয়স ২৫।২৬, মোটামুটি স্বাস্থ্যবান, সুদর্শন

যুবক। ডান হাতে একটা অ্যাটাচি, বাঁ হাতে একটি বাংলা সংবাদপত্র। সোজা চলে এলো দোতলায়, ডাক্তারের ঘরে। ঘরের দিকে এক পলক তাকিয়ে নিল। দু'টি প্রাণী অর্দ্ধচেতন অবস্থায় পড়ে আছে। সারা ঘর পোড়া সিগারেট আর ছাই-এ ভর্ত্তি। মৃদুস্বরে ডাকল—কাকাবাবু—কাকাবাবু। কোন এক অতল গহ্বর থেকে যেন ডাক্তার চেতনা ফিরে পেলেন। কোন প্রকারে বললেন—"কে? প্রণব!" প্রণব কাছে গিয়ে বলল—"হ্যাঁ আমি"।

প্রণাম করতে গিয়ে বাধা পেল প্রণব।

"থাক, মজা দেখতে এসেছ?"—ডাক্তারের কান্না যেন দলা পাকিয়ে গলায় উঠে এল।

"না, কাকাবাবু, আমি এই মাত্র রাঁচি থেকে ফিরছি। ওখানে একটা বড় ওষুধ কোম্পানীর আমি chief chemist. সকালে হাওড়ায় নেমে বাড়ী ফেরার পথে ট্যাক্সিতে কাগজ পড়ে সব জানলাম। এর আগে আমি কিছুই জানতাম না। আপনি বিশ্বাস করুন। সোমাকে আমার হাতে দিয়ে আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন। আমি তাকে অসম্মান করবো না।"—একদামে কথাগুলো বলে গেল প্রণব। ডাক্তারের চোখ বিস্ফারিত হলো। চেষ্টা করেও এখন আর কান্না চেপে রাখতে পারলেন না। বাঁধ না মানা অশ্রুর স্রোত বয়ে চলেছে। এবার চাইলেন অলকার দিকে। শুকিয়ে যাওয়া শাড়ীটা আবার নতুন করে ভিজে যাচ্ছে।

প্রণব ততক্ষণে পা বাড়াল সোমার ঘরের দিকে।

ডাক্তার দেখলেন সূর্য্যের আলো জানালা দিয়ে তাঁর ঘর ভরে দিয়েছে। এ যেন এক অচেনা সূর্য্য। নতুন সূর্য্যের আলোয় সারা ঘর আলোকময়।

নিশি রাতের ঘণ্টা ধ্বনি

সুভাষ মজুমদার

এত রাতে বেরিয়ে পড়া ঠিক হয় নি।

ঝাঁ ঝাঁ করছে নিশি রাত। ঘুটঘুট্টি অন্ধকার। নিজের হাতটা পর্যন্ত ভাল করে দেখা যায় না। ওদিকে টর্চের ব্যাটারিও ফুরিয়ে আসছে। দমদমা লুথেরিয়ান মিশনের বড়ো পাদ্রী স্ট্যানলী ব্যারন চিন্তিত হয়ে উঠলেন।

না। মদনবাটী মিশনে থাকাই উচিৎ ছিল। কিন্তু কি আর করা যাবে। বেরিয়ে যখন পড়েছিই!

রাস্তাটা ভাল এই যা রক্ষে! জোর প্যাডেল করেছেন ফাদার ব্যারন। ঝড়ের গতিতে সাইকেল চলছে। ক্রমশ টর্চের আলো লাল হয়ে আসছে। অনেক—অনেক কষ্টে পথ দেখতে হচ্ছে। দেখতে দেখতে পার হয়ে গেলেন টাঙন নদীর নড়বড়ে বাঁশের পুল, পার হয়ে গেলেন গোয়াল কেলানীর শ্মশান। আর কিছুক্ষণ—অন্তত আধঘণ্টা এই গতিতে সাইকেল চালাতে পারলেই তিনি দমদমা মিশনে পৌঁছে যেতে পারতেন! কিন্তু হলো না—

বৃষ্টি নামল। বাধ্য হয়ে তিনি রাস্তার পাশে বৈষ্ণবাটি গ্রামে এলেন। বৈষ্ণবাটি দেশীয় খ্রীষ্টানদের গ্রাম। এখানকার সব বাড়িতে বাড়িতে তাঁর দ্বার অবারিত। 'বড়ো পাদ্রী' বলতে এ অঞ্চলের সাঁওতাল, উরাঁও—সাধারণ ব্রাত্য মানুষের চোখের দৃষ্টি শ্রদ্ধায় নত হয়ে ওঠে।

—এই জন—এই জন টুডু, একেবারে ভিজে গেলাম রে—

—একি ফাদার! এত রাত্রে?

জন টুডু তাকে খুব যত্ন করে খাইয়ে দাইয়ে বলল, ফাদার আমাদের দড়ির খাটিয়ায় শুতে পারবে তো?

হা হা করে হেসে উঠলেন স্ট্যানলি ব্যারন। বললেন, তোমাকে ব্যাপ্টাইজ করেছি পনের বছর হয়ে গেল। তারও প্রায় পঁচিশ বছর আগে থেকে তোমাদের এই দেশে আছি। খাটিয়া তো ভাল,—বিল, মাঠ পুকুরের উঁচু পাড়ে পর্যন্ত কত রাত কাটাতে হয়েছে আমাকে। আচ্ছা যাও—আমেন!

বাইরে ঘন অন্ধকারে সমানে বৃষ্টি ঝরছে। ধু-ধু ফাঁকা মাঠে শোঁ। শোঁ। বাতাস অব্যক্ত যন্ত্রণার কাতরানির মত গোঙাচ্ছে। বৃষ্টির একটানা ঝরঝর শব্দে, ঝড়ো বাতাসের গর্জনে পৃথিবীটা যেন একেবারে লোপ পেয়ে যাবে আজ রাত্রে। পরিশ্রমের ক্লান্তিতে দেহ ভেঙে আসছে ব্যারনের। কিন্তু ঘুম আসছে না। হঠাৎ চমকে উঠলেন তিনি। বাতাসের বিক্ষুব্ধ আর্তনাদ, মেঘের ডাক, বৃষ্টির শব্দকে ছাপিয়েও একটা ক্ষীণ শব্দের রেশ তার কানে এল।

ডিং-ডং....ডিং-ডং...ডিং ডং —

চার্চ বেল! ভোর হয়ে গেল? ঘড়ি দেখলেন। না। ভোর তো নয়। মাত্র রাত দু'টো! এতরাত্রে চার্চের বেল বাজবে কেন! কোন চার্চ? সবচেয়ে কাছে তাদের দমদমার সেণ্ট ডেভিড কাথেড্রাল চার্চ। কিন্তু তার ঘণ্টা এখন বাজবে কেন?

বুকের ভেতরটা ঢিব ঢিব করতে লাগল। চুলের গোড়ায় গোড়ায় ঘাম জমে উঠল। ছিঃ ছিঃ তিনি ভয় পাচ্ছেন? ভয়ের অস্বস্তিটাকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে ব্যারন জানালাটা খুলে দিলেন।

ডিং-ডং...ডিং-ডং...ডিং-ডং —এবার শব্দ আরো স্পষ্ট শোনা গেল। মনে হল আরও কাছে—

ব্যারনের কানের পিঠ দু'টো গরম হয়ে উঠল। মনে হল খুব গরম লাগছে। চীৎকার করে ডাকলেন টুডু—জন টুডু—।

ঘুম ভেঙে ধড়মড় করে উঠে বসল টুডু। ফাদার স্ট্যানলী ব্যারনের চীৎকার শুনে ছুটে এল। আর তার চোখমুখ দেখে সে থমকে দাঁড়ালো।

—শুনতে পাচ্ছ জন—শুনত পাচ্ছ চার্চের বেল?

টুডুর কানেও পড়েছে সেই দূরাগত বিচিত্র শব্দ। তার চোখে ভয়ের ছায়া পড়ল। বিড়বিড় করে বলল, ফাদার, আপনি আমার কোন অপরাধ নেবেন না। বললেন না, 'কুসংস্কার'! ওখানে—

—কি বলতে যাচ্ছো, খোলাখুলি বলো না?

—টাজার মাঠ ছাড়িয়ে গেলে একটা খাড়ি পাওয়া যায়—।

হ্যাঁ হ্যাঁ দেড়শো বছর আগে ওই খাড়িটাই ছিল টাজনের। টাজনের ওই খাড়িটাই ছিল টাজনের ওরিজিন্যাল কোর্স। টাজনের বুকের ওপর দিয়ে তখন বড় বড় বাণিজ্যতরী যাওয়া আসা করতো, ভয়ের চিহ্ন মুছে গিয়ে অদ্ভুত

একটা পরিতৃপ্তির ছাপ ফুটে উঠল ব্যারনের চোখেমুখে। দড়ির খাটিয়ার ওপরে বসে দু'হাতে বুক চেপে ধরে বলতে লাগলেন, তোমাদের দেশের আরলি হিষ্ট্রি আমার নখদর্পণে বুঝলে জন। খাড়ির ওপারে যে উঁচু ঢিবিটা আছে, সেখানে ছিল এ অঞ্চলের প্রথম মিশনারী ফাদার ফার্ণাণ্ডেজের প্রতিষ্ঠিত মিশন আর গির্জা। ফার্ণাণ্ডেজকে দীক্ষা দিয়েছিলেন, মদনবাটী মিশনের বড়ো ফাদার সেই ইতিহাস-বিখ্যাত উইলিয়ম কেরী। ফার্ণাণ্ডেজ এখানে একটা ডিসপেন্সারী খুলেছিলেন, একটা স্কুলও প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন সেই আমলে। অনেক জনহিতকর কাজ করতেন। আরও হয়তো অনেক কিছু করতে পারতেন, কিন্তু টাঙনের জল হঠাৎ ফুলে উঠেছিল, ফুঁসে উঠেছিল। যাকে বলে ফ্লাড—বন্যা। সেই ফ্লাডের কথা লেখা আছে—দিনাজপুর ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে বুঝলে জন। সেই বন্যার জলে ফার্ণাণ্ডেজের মিশনবাড়ি, গীর্জা সব ডুবে গেল। দু'মাস পর যখন বন্যার জল টানতে সুরু করল তখন দেখা গেল, মাটির ঘরগুলোর কোন চিহ্ন পর্যন্ত নেই। মিশনের পাকাবাড়িও ধ্বসে গেছে। তারপর সুরু হল মহামারী। দেখতে দেখতে এই 'লোক্যালিটি' শ্মশানের মত হয়ে গিয়েছিল। ফাদার ফার্ণাণ্ডেজ যে মনের দুঃখে কোথায় চলে গিয়েছিলেন তা' কেউ বলতে পারে না। অনেকক্ষণ একটানা কথা বলে হাঁপাতে লাগলেন স্ট্যানলী ব্যারন। বুকের ওপর মাথাটা ঝুলিয়ে বসে থাকলেন। আর—

জন টুডু খোলা জানালার দিকে ভয়ে ভয়ে তাকাতে লাগলো। সোনাডাঙ্গার মাঠের পাশে খাড়ির ওপারে জঙ্গলে ঢাকা সেই উঁচু ডিবিটার দিক থেকেই যে গীর্জার ঘন্টা শুনতে পাওয়া যায়, এই কথাটা ফাদারকে বলে কি ক'রে। বললেই ধমকাবে। কিন্তু বৈদ্যবাটীর বুড়ো সরেন মাঝি যা বলে তা' শুনলে তো ফাদার মারতে আসবে তাকে। সরেন মাঝির সেই ভয়ঙ্কর কথাটা তাকে বলবে কি ?

—জন কি ভাবছো ?

—দেখ, তুমি কি মনে কর, ফার্ণাণ্ডেজের মিশনবাড়ি সেই ঢিবি থেকেই চার্চের বেল শুনতে পেলাম আমরা ?

—হ্যাঁ ফাদার। লোকে বলে—

—সাট আপ ? খবরদার এ কথা বলো না। তুমি ব্যাপ্টাইজড হয়েছো।

কিন্তু তোমার আত্মার ভেতরে এখনও শয়তান বাস করছে। তোমার মনের ভয়; আমার নার্ভের উইকনেস কেটিগ—

ডিং-ডং···ডিং-ডং···ডিং-ডং—

আবার সেই শব্দ। মুহূর্তে স্তব্ধ হ'য়ে গেলেন ফাদার স্ট্যানলী ব্যারন। মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে উঠল। কিন্তু হঠাৎ একটা কাণ্ড করে বসলেন। দড়াম করে দরজা খুলে বেরিয়ে পড়লেন।

—ফাদার করছেন কি, কোথায় যাচ্ছেন?

মানুষগুলো অদ্ভুত। চোখ নেই। চোখের জায়গায় শুধু থকথকে কালো একটু অন্ধকারের আভাস। নাক নেই। আছে দু'টো ছোট ছোট গর্ত। মুখ নেই, সেখানে বড় বড় দাঁত অন্ধকারে চক চক করছে। আর সেই দাঁতে খলখল হাসি বাজছে—

—ছিঃ ছিঃ আপনারা পাদ্রী হয়ে লোককে ভয় দেখান? আপনারা ডাকাত—আপনারা গুণ্ডা, দু'হাতে তাদের দিকে কিল চড় ঘুসি ছুঁড়তে ছুঁড়তে পাগলের মত এগিয়ে গেল ন্যাথানিয়াল। লাটাগাছের কাঁটায় তার গা ছড়ে গেল। রক্ত পড়তে লাগল। মাটির ওপরে মুখ থুবড়ে পড়ল। আবার ওঠার চেষ্টা করল। কিন্তু এ কী।

থকথকে কালো রক্তের ভেতরে সে যেন ডুবে যাচ্ছে একটু একটু করে। বন্ধ হয়ে আসছে নিঃশ্বাস। মুখ ডুবছে। নাক ডুবছে·····

কড়-কড়-কড়াৎ—

ডিং-ডং···ডিং-ডং···ডিং-ডং;

হা-হা হা-হা—

সেই মেঘের আওয়াজ, গীর্জার ঘণ্টার শব্দ, আর প্রচণ্ড অট্টহাস্যের ধ্বনি মিলিয়ে মনে হল, যেন একটা মহাপ্রলয় ছুটে আসছে এই দিকে।

পরদিন বৈষ্ণবাটীর লোক দেখল, সেই উঁচু ঢিবির কছে একটা নীচু জলাজমিতে কে যেন পুঁতে রেখেছে ন্যাথানিয়ালকে। মাথাটা মাটির ভেতরে। পা ওপরে।

কার্ণাগুঞ্জের মিশনবাড়ির সেই অভিশপ্ত ধ্বংসস্তূপ আজও আছে। আজও দিনদুপুরে পর্যন্ত কোন জনপ্রাণী সেদিকে ছায়া মাড়ায় না। অদ্ভুত একটা ভয় ছমছম করে গ্রামের লোকের মনে, যদি আচমকা কারোও কানে পড়ে যায় সেই গীর্জার ঘণ্টা ডিং-ডং···ডিং-ডং···ডিং-ডং—

[প্রেততত্ত্ববিদ্ এ্যালাস ডিয়ার এ্যালপিন ম্যাকগ্রীগর (Alas dair Alpin Macgregor) বহুকাল ধরে গ্রেট বৃটেন, জার্মানী, সুইজারল্যাণ্ডের বিভিন্ন শহরে গ্রামে পুরানো কালের 'ভূতুড়ে' বলে চিহ্নিত অনেক ধ্বংসস্তূপ পরিদর্শন করেছেন। তাঁর মতে অন্ধকার, জঙ্গলে ভরা, জনমানবহীন ধ্বংসাবশেষ, কি পড়ো বাড়ি প্রেতাত্মাদের খুব প্রিয় জায়গা। তাঁর এই মতামতটি সর্বদেশে সর্বকালে সত্য। এ দেশের বহু শহরের উপকণ্ঠে কি গ্রামে ভূতুড়ে পড়ো বাড়ি এবং চকমিলানো প্রসাদের ধ্বংসাবশেষের অভাব নেই। ম্যাকগ্রীগর সাহেবের বিচিত্র অভিজ্ঞতার বই সেই 'ঘোষ্ট বুক—স্ট্রেঞ্জ হান্টিংস ইন্ বৃটেন' (Ghost book strange hauntings in British)—গ্রন্থের 'Phantom bells' গল্পের ছায়া সামান্য রয়েছে এই গল্পে।]

নাইটিঙ্গেল

সমীর চট্টোপাধ্যায়

রাজা হবুচন্দ্রের মনে খুশী আর ধরে না। এমন সুন্দর রাজ্য তাঁর আর কোথায় আছে! দুধের মত সাদা শ্বেতপাথর দিয়ে গড়া তার রাজপ্রাসাদ। তার পাশেই রয়েছে ছবির মত সুন্দর এক ফুলের বাগান। কত রকমারী রঙবাহারী মন মাতানো ফুল ফুটে রয়েছে সেই বাগানে। সব চাইতে সুন্দর ফুলেরা ফুটে আছে যে গাছে তাতে বাঁধা আছে রূপালী ঘুঙুর। বাতাসের তালে তালে সেই ঘুঙুরে রিমি-ঝিমি বাজনা বেজে চলে, আর তারই সাথে ওরা যেন বলতে থাকে—চেয়ে দেখ, আমরা কত সুন্দর ফুল ফুটে আছি এই ফুল বাগিচায়। সত্যি ছবির মত সুন্দর এই ফুল বাগান। ফুলেরা তাদের রঙের এই বাহার নিয়ে ফুটে আছে কতদূর কে বলতে পারে! হয়ত মালীরাও বলতে পারে না কোথায় এর শেষ।

এই ফুলের বাগান যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে শুরু হয়েছে এক সুন্দর সবুজ বন। কত রকমারী ছোট বড় গাছ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে এই বনে। বনেব মাঝে রচিত হয়েছে কত সুন্দর সুন্দর জলাশয়। সবুজ সুন্দর এই বন শেষ হয়েছে নীল সাগরের কোলে। পাল তুলে কত জাহাজ ভেসে যায় এই নীল সাগরের বুকে। সেই নীল সাগরের পারে যেখানে মাথা উঁচু করে করে দাঁড়িয়ে আছে লাল পলাশের গাছ—তারই এক ডালে থাকতো একটি ছোট্ট পাখী নাইটিঙ্গেল। আকাশ একেবার রাঙা করে দিনের আলো যখন যেত নিভে—ধীরে ধীরে আকাশে যখন তারার মালার হাট বসতো– ঠিক সেই সময় সেই ছোট্ট পাখী নাইটিঙ্গেল তার মধুর গান গাইতে থাকতো। আবার রাত যখন ধীরে ধীরে গভীর হয়ে এগিয়ে যেতে ভোরের দিকে—সোনালী রোদ্দুর আকাশে যখন উঁকি ঝুকি মারতে থাকতো, ঠিক সেই সময় নাইটিঙ্গেল তার মধুর গান গাইতে থাকতো। তার গানের সুরে সুরে যেন আকাশের চাঁদ আর তারার একে একে ঘুমিয়ে পড়তো আকাশ রাঙা করে সোনালী রোদ ছড়িয়ে

পড়তো সবুজ বনের চারিধারে। নাইটিঙ্গেলের গানের তালে তালে নীল সাগরের ঢেউয়েরা সবুজ বনের কোলে আছড়ে পড়তো। নীল সাগরের বুকে জাল মেলে দিয়ে গরীব জেলে অবাক হয়ে শুনতো নাইটিঙ্গেলের মধুর গান। শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে যেত—ভুলে যেত তারা মাছ ধরার কথা—বাড়ী ফেরার কথা। এ গাছ থেকে ও গাছে গান গেয়ে ফিরতো নাইটিঙ্গেল, আর তারই গানের সুরে সুরে সাগর পাড়ের বানানীতে আনন্দের হাট বসতো।

কত দেশ থেকে কত রাজকুমার আসতো রাজা হবুচন্দ্রের এমন সুন্দর রাজ্য দেখতে। এমন সুন্দর রাজবাড়ী, এমন সুন্দর ফুলের বাগান, সবুজ বন, নীল সাগর দেখে তারা অবাক হয়ে যেত—খুশী হ'ত কত! বাহবা দিত রাজা হবুচন্দ্রকে। কিন্তু যখন তারা শুনতে পেল নাইটিঙ্গেলের মধুর গান, সব কিছু ভুলে গিয়ে নাইটিঙ্গেলের সুরের মূর্চ্ছনায় তন্ময় হয়ে গেল তারা। এমন মধুর গান কে গাইতে পারে!

নিজের দেশে ফিরে গিয়ে রাজা হবুচন্দ্রের রাজ্যের প্রশংসা করে কত চিঠি লিখতো তারা। এমন সুন্দর রাজ্যের কত সুন্দর বর্ণনা দিয়ে লেখা কত শত চিঠি দেশ বিদেশ থেকে এসে ভীড় জমালো রাজা হবুচন্দ্রের কাছে।

সোনার সিংহাসনে বসে রাজা এক একখানি চিঠি খুলে কয়েক লাইন পড়েই রেখে দেন। মুখে তাঁর হাসি ফুটে ওঠে—খুশীতে মেতে ওঠে তাঁর মন। তাঁর রাজ্যের এত প্রশংসা শুনতে শুনতে বুকখানা তাঁর গর্বে ফুলে ওঠে। মন্ত্রী, সভাসদ্ সকলেই খুশীতে মেতে ওঠে—খুশীর হাট বসে রাজার সভায়। কিন্তু সেদিন একখানি চিঠি পড়তে পড়তে রাজার মুখের হাসি গেল হারিয়ে—রক্তিম হয়ে উঠল তাঁর মুখখানা। দুঠি ঠোঁট নেড়ে গম্ভীর স্বরে বলে উঠলেন রাজা হবুচন্দ্র,—মন্ত্রী, আমার রাজের এই সুন্দর রাজপ্রাসাদ, রঙ্‌বাহারী ফুলের বাগান, সবুজ পাতায় ঘেরা সবুজ বন, নীল সাগর—এ সব কিছুর চাইতে নাকি সুন্দর নাইটিঙ্গেলের মধুর গান! এ কী করে সম্ভব মন্ত্রী? দেশে বিদেশে আমার রাজ্যের নাইটিঙ্গেলের সুমধুর গানের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে; আর আমি সেই দেশের রাজা হয়ে দেখিনি নাইটিঙ্গেলকে—শুনিনি তার মধুর গান! যেমন করেই হোক; যেমন করেই হোক আজকের সন্ধ্যার আসরে নাইটিঙ্গেলকে দেখতে চাই—শুনতে চাই তার মধুর গান।

বৃদ্ধমন্ত্রী গবুচন্দ্র অবাক বিস্ময়ে শুনছিল রাজা হবুচন্দ্রের কঠিন আদেশের কথা।

তার মুখের হাসিখুশি কোথায় গেল হারিয়ে। করজোড়ে মিনতির সুরে শুধু নিবেদন করল বৃদ্ধ মন্ত্রী গবুচন্দ্র, মহারাজ, এমন নাইটিঙ্গেলকে তো আমরাও দেখিনি কোনদিন—শুনিনি তার মধুর গান। নিশ্চয়ই মহারাজ, রাজকুমারেরা ভুল দেখেছেন – ভুল শুনেছেন নাইটিঙ্গেলের গান।

গর্জ্জে উঠলেন রাজা—ভুল! ভুল তোমার মন্ত্রী। দেশ বিদেশের সকল রাজকুমারেরা আমার রাজ্যের সব কিছুর প্রশংসা করে সব শেষে লিখছেন ওই একই কথা, আর তুমি বলছ ভুল! যেমন করেই হোক আজকের সন্ধ্যায় এই রাজসভার আসরে দেখতে চাই নাইটিঙ্গেলকে—শুনতে চাই তার মধুর গান। নইলে সবার গর্দান যাবে জেনো!

বৃদ্ধ মন্ত্রী রাজার এই কঠিন আদেশের কথা শুনে কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে এলেন রাজসভা থেকে। তার রক্তিম মুখখানি সাদা ফ্যাকাশে হয়ে গেল নিমেষে। কথাটা ছড়িয়ে পড়লো রাজসভার সর্বত্র! বৃদ্ধমন্ত্রী হন্তদন্ত হয়ে সবার কাছে শুধু একই কথা বলে চললেন,—বলতে পারো কোথায় আছে নাইটিঙ্গেল? ধীরে ধীরে আতঙ্কের কালো ছায়া ঘনিয়ে এল রাজকর্ম্মচারীদের মুখে। সবার মুখে ওই একই কথা।

এদিকে রাজবাড়ীতে রঙীন সামিয়ানা খাটানো হ'ল। রঙ্‌বেরঙের বাতিদানি আর ফুলদিয়ে সাজানো হ'ল রাজপ্রসাদ। শানাইয়ের সুরে সুরে সমস্ত রাজবাড়ী মাতোয়ারা হয়ে উঠল। এক অপরূপ রূপে রচিত হ'ল রাজ আসর। আজ সন্ধ্যায় এই আসরেই তো গাইবে নাইটিঙ্গেল তার মধুর গান।

হন্তদন্ত বৃদ্ধ মন্ত্রীর সকরুণ মুখখানির দিকে চেয়ে রাজবাড়ীর ঝিএর ছোট্ট মেয়েটা মিষ্টি গলায় শুধু বললে,—ও মন্ত্রীদাদু, তোমরা কার কথা বলছ, নাইটিঙ্গেল? সে তো থাকে ওই নীলসাগরের পাড়ে, লাল পলাশের ডালে। আমি রোজ সন্ধ্যায় যখন এই রাজবাড়ীর ফেলে দেওয়া খাবার নিয়ে যাই আমার রুগ্ন মায়ের কাছে—নীলসাগরের পাড়ে সেই ভাঙা কুটীরে তখন শুনতে পাই নাইটিঙ্গেলের গান। কী সুন্দর তার গান! গান শুনতে শুনতে এত দূরপথের দুঃখ যাই ভুলে।

বৃদ্ধ মন্ত্রীর দুটি ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠল—মুখখানি তাঁর খুশীতে উজ্জল হয়ে উঠল। আদরের সুরে শুধু বলল,—তোদের আর কোন দুঃখ থাকবে না। চিরদিন এই রাজবাড়ীতে থাকতে দেব তোদের—রাণীমার ঘরে যেতে দেব, শুধু দেখিয়ে দে কোথায় আছে সেই ছোট্টপাখী নাইটিঙ্গেল।

ছোট্ট মেয়েটার পিছু পিছু বৃদ্ধমন্ত্রী আর রাজ কর্মচারীরা এগিয়ে চলল। সুদীর্ঘ ফুলের বাগান পার হয়ে সবুজ বনের পথে পা বাড়াল তারা। পথে যেতে যেতে গম্ভীর স্বর ভেসে এল মন্ত্রীর কানে। মন্ত্রী শুধু বললে—বাঃ চমৎকার গান গায় তো নাইটিঙ্গেল। এই শুনে ছোট্ট মেয়েটা খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল, আর বলল,—ওমা, ও মন্ত্রীদাদু, ওতো গরু ডাকছে। মন্ত্রী লজ্জিত হলেন। আবার এগিয়ে চলল তারা। যেতে যেতে আবার ভেসে এল গ্যাঙোর গ্যাঙোর অবিরাম স্বর। মন্ত্রী ভাবলে, এ ঠিকই নাইটিঙ্গেলের গান। তাই বললে,—সত্যি সুন্দর গায়, সুরের বাহাদুরী আছে বটে। এবারেও খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল ছোট্ট মেয়েটা আর বললে,—ওতে কতগুলো ব্যাঙ ডাকছে। এগিয়ে চল, ওই দূরে শুনতে পাবে নাইটিঙ্গেলের গান যেখানে দাঁড়িয়ে আছে লাল পলাশ গাছ। এবার কিন্তু তারা ঠিক লাল পলাশের নীচে এসে দাঁড়ালো - শুনতে পেল নাইটি-ঙ্গেলের মধুর গান। ধুসর বর্ণের ছোট্ট পাখী তার মধুর সুরের মূর্চ্ছনায় অ'াক করে দিল বৃদ্ধমন্ত্রী আর সবাইকে। মেয়েটা ডেকে ডেকে বললে,—ও নাইটিঙ্গেল, তোমায় নিয়ে যেতে রাজমন্ত্রী এসেছে। রাজা হবুচন্দ্র আজ সন্ধ্যার আসরে তোমার গান শুনবেন! রাজ আসর কত সুন্দর করে সাজানো হয়েছে! এই কথা শুনে নাইটিঙ্গেলও খুব খুশী হোল। মনে মনে বললে—এতদিন পরে তার গানের সত্যিকারের কদর দেবে স্বয়ং রাজা হবুচন্দ্র।

মন্ত্রীর সাথে নাইটিঙ্গেল সন্ধ্যার আসরে এসে হাজির হোল। রাজার মুখে হাসি উঠল ফুটে—খুশীতে মেতে উঠল রাজবাড়ীর সবাই। সোনার দাঁড়ে বসানো হোল নাইটিঙ্গেলকে। সোনার সিংহাসনে বসে রাজা শুনতে লাগলেন নাইটিঙ্গেলের মধুর গান। নাইটিঙ্গেলের মধুর গানের সুরে সুরে আকাশের তারারা ভীড় জমালো রাজবাড়ীর ছোট্ট আকাশটুকুতে—চাঁদের হাসি উছলে উঠল, সবাই তন্ময় হয়ে গেল। বিভোর হয়ে গেলেন রাজা নাইটিঙ্গেলের গানের সুরে সুরে। দুগাল বেয়ে তাঁর চোখের জল গড়িয়ে পড়ল। নাইটিঙ্গেলের করুণ সুরের করুণা যেন ফুটে উঠল রাজার চোখের জলে। নাইটিঙ্গেল খুশী হোল। খুশী হয়ে শুধু বললে,—সত্যি রাজা, তোমায় আমি খুশী করতে পেরেছি—তোমার চোখের জলেই আমি সে খুশী খুঁজে পেয়েছি।

সেই দিন থেকে নাইটিঙ্গেল হোল রাজার নিত্য সাথী। নাইটিঙ্গেলের গানের সুরে সুরে রাজা ঘুমিয়ে পড়েন, আবার তারই গানের সুরের পরশে জেগে ওঠেন

রাজা। এমনি করে রাজার সুখের দিন কাটতে লাগলো নাইটিঙ্গেলকে নিয়ে।

নাইটিঙ্গেলকে নিয়ে কত কাব্য রচিত হোল দেশে বিদেশে। আর সেই উপহারের ভীড় জমালো রাজা হবুচন্দ্রের কাছে।

এমনি একটি উপহার—একটি ছোট্ট বাক্স এসে হাজির হ'ল রাজার কাছে। তার উপরে শুধু লেখা 'নাইটিঙ্গেল', নীলপুরী রাজ্যের রাজার শুভেচ্ছা। রাজা ভাবলেন, এও বুঝি কোন কাব্যগ্রন্থ—তাঁর নাইটিঙ্গেলে প্রশস্তি। কিন্তু বাক্স খুলতেই অবাক হলেন রাজা। এ যে অবিকল তাঁর নাইঙ্গেলের মত আর এক নাইটিঙ্গেল। দেখতে তো তার নাইটিঙ্গেলের চাইতে অনেক সুন্দর! চোখ দুটিতে দুটি রক্তরাগ মণি। ডানায় ছড়ানো রয়েছে নীলকান্ত মণি। গলায় মুক্তোর মালা। তাইতো, ধূসর বর্ণের নাইটিঙ্গেলের চাইতে এতো অনেক সুন্দর! কথাটা ধীরে ধীরে সবার কাছে পৌঁছাল। পণ্ডিত এলেন। বারে বারে নেড়ে চেড়ে দেখলেন। শেষে মাথা নেড়ে শুধু বললেন,—মহারাজ, এ কলের পাখী নাইটিঙ্গেল। দম দিলেই গান গাইবে। পণ্ডিতের কথাই সত্যি হোল। দম দিতেই গান গাইতে লাগলো। আবার দম শেষ হতেই গান গেল থেমে। আবার দম দিতে একই গান—একই সুরে একই তালে আবার গাইল, দম শেষ হ'তে আবার গেল থেমে। রাজা বললেন—বাঃ এ নাইটিঙ্গেল তো অনেক ভালো, যত খুশী দম দেবো তত গান গাইবে। রাজার দ্বিগুণ উৎসাহে মন্ত্রী বলে উঠলো,—মহারাজ, এই কলের পাখী নাইটিঙ্গেল, বনের পাখী নাইটিঙ্গেলের চাইতে অনেক ভালো, যত খুশী দম দেবো তত গাইবে। মহারাজ, আজ সন্ধ্যায় এ দুটি নাইটিঙ্গেলের দ্বৈত সংগীত শোনা যাক্, তা হয়তো আরও মধুর শোনাবে। রাজা খুশী হ'লেন।

সন্ধ্যার আসরে কলের পাখী নাইটিঙ্গেল আর বনের পাখী নাইটিঙ্গেলের দ্বৈত সংগীত শুরু হোল। কলের পাখী কলের তালে তালে একই গান গেয়ে চলল; কিন্তু বনের পাখী গেয়ে চলল আপন মনে—আপন সুরে—হৃদয় ঢেলে। দম শেষ হ'তে কলের পাখী গেল থেমে, কিন্তু বনের পাখী তখনও গান গেয়ে চলল। রাজা বিরক্ত হ'লেন। বল্লেন,—বনের পাখীর তাল গেছে হারিয়ে, কলের পাখী কিন্তু তালের মাপ ঠিক রেখেছে। সবাই রাজার কথায় মাথা নাড়ালেন, বল্লেন,—আপনি ঠিকই বলেছেন মহারাজ।

এখন থেকে এই কলের পাখীকেই আমার নিত্যসাথী করে রাখব—এই বলে

রাজা কলের পাখীটাকে কাছে এনে বারে বারে দম দিয়ে শুনতে লাগলেন কলের পাখীর গান—একই সুরে বাঁধা, এক তাল—একই বুলি।

প্রাণ দিয়ে গড়া—সমস্ত হৃদয় দিয়ে গাওয়া গানের এই অবমাননা সহ্য করতে পারলে না বনের পাখী নাইটিঙ্গেল। দুঃখে তার দুটি চোখ জলে গেল ভরে। মনের দুঃখে উড়ে গেল বনের পাখী নাইটিঙ্গেল সবুজ বনে।

কলের পাখী নাইটিঙ্গেলকে নিয়ে রাজার সুখের দিন এগিয়ে চলল। কলের পাখী নাইটিঙ্গেলের কথা সবার মুখে। সবার মুখে ভেসে বেড়াতে লাগলো বারে বারে গাওয়া সেই একই গানের কলি। সোনার পালঙ্কে রাজা কলের পাখীর গান শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েন।

এমনি করে কত সুখের বছর গেল কেটে। একদিন সোনার পালঙ্কে শুয়ে রাজা গান শুনছেন, হঠাৎ ঘড় ঘড় একটা শব্দ হয়ে গান গেল থেমে। কলের পাখী বিকল হ'ল। রাজা চিন্তিত হ'লেন। সেই রাতেই রাজবদ্যির ডাক পড়লো। রাজবদ্যি কত পরীক্ষা করলেন। চোখ, মুখ, পেট সব কিছু পরীক্ষা করে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে রাজবদ্যি সবিনয়ে মহারাজকে জানলেন যে তাঁর প্রাণপাখী আর বেঁচে নেই - সে এতক্ষণে চলে গেছে তার স্বর্গের নন্দন কাননে—সেখানে সে গাইছে তার মধুর গান। রাজার মুখের হাসি, মনের খুশী গেল হারিয়ে। দুঃখে রাজার দু'চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে রাজা শুধু বললেন,—মন্ত্রী, আর বুঝি বাঁচবনা বেশী দিন। নাইটিঙ্গেলের গান না শুনলে আমি কেমন করে বাঁচব! মন্ত্রীও দুঃখীত হলেন, তারও দু'চোখ বেয়ে অঝোরে জল ঝরতে লাগলো। কত রাজবদ্যি—কত চিকিৎসা চলল, কিছুতেই কিছু হ'ল না। কলের পাখী আর গাইলো না গান। আসলে ওর আসল অসুখের কথা কেউই পারলে না জানতে। ওর যে স্প্রীং গেছে কেটে সে কথা বুঝবে কেমন করে নাড়ীটেপা রাজবদ্যি?

এমনি করে রাজার দুঃখের দিন এগিয়ে চলল। রাজা কঠিন অসুখে পড়লেন। মনের অসুখ রাজার বেড়েই চলল। কত দেশ থেকে কত রাজবদ্যি এল। সমস্ত রাজবাড়ীতে শোকের ছায়া নেমে এল। রাজা বুঝি আর বাঁচবে না। সোনার পালঙ্কে শুয়ে রাজা শুধু বিলাপের সুরে বলেই চলেছেন,—নাইটিঙ্গেল, আর তুমি গাইবে না গান, কেন গাইবে না?

সেদিন রাতে রাজবদ্যি মন্ত্রীকে ডেকে চুপি চুপি বললেন,—আর কোন আশা নেই মন্ত্রী, এ রাতই বুঝি তাঁর শেষ রাত।

ধীরে ধীরে রাত হয়ে এল। ঘুমের ঘোরে রাজা ভয়ে ভয়ে চারিদিকে চেয়ে দেখলেন কালো অন্ধকার যমদূতের মত যেন তাঁকে ঘিরে ধরেছে—আর ইসারায় যেন কোথায় নিয়ে যেতে চাইছে। রাজা কেঁদে কেঁদে বলতে লাগলেন—নাইটিঙ্গেল! তুমি কি আর গাইবে না গান?

রাতের সমীরণ বনের পাখী নাইটিঙ্গেলের কানে কানে গেয়ে গেল কান্নার গান। সুখপাখী নাইটিঙ্গেল এ দুঃখ কিছুতেই সইতে পারলো না। তার অভিমান কোথায় গেল হারিয়ে। বনের পাখী আবার উড়ে এল রাজপ্রাসাদে। জানালার ফাঁক দিয়ে রাজার ঘরে ঢুকে পড়লো সে। রাজার শিয়রে বসে গাইতে লাগলো মধুর গান। গানের সুরে সুরে চাঁদের আলোর হাট বসলো রাজার ঘরে। রাজা অবাক হয়ে চোখ মেলে চাইলেন—কোথায় গেল অন্ধকারের হাতছানি! শুনতে পেলেন বনের পাখী নাইটিঙ্গেলের মধুর গান। মুখখানি তাঁর খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বনের পাখী নাইটিঙ্গেলকে জড়িয়ে ধরে আদর করে বললেন,—না—না নাইটিঙ্গেল, তোমাকে আর কিছুতেই ছাড়ব না আমি, তোমায় ছেড়ে থাকবো কেমন করে? তোমার খুশী মত শুধু গান শোনাবে আমায়। আর এই কলের পাখী নাইটিঙ্গেলকে টুকরো টুকরো করে ভেঙে ফেলে দেবো এক্ষুণি—। বাধা দিয়ে বনের পাখী নাইটিঙ্গেল শুধু বললে,—ও তো কলের পাখী নাইটিঙ্গেল মহারাজ, ওর কী দোষ! আমি বনের পাখী নাইটিঙ্গেল, বনই আমার ভাল। রাজপ্রাসাদের এই ঐশ্বর্য দিয়ে কী হবে আমার! আমি রোজ রাতে তোমায় গান শুনিয়ে যাব। সুখ-দুঃখের কত মধুর গান। এই বলে নাইটিঙ্গেল তার মধুর গান গাইতে লাগল। গানের সুরে সুরে রাজা ঘুমিয়ে পড়লেন। বনের পাখী নাইটিঙ্গেল উড়ে গেল বনে।

সকাল হোল। সোনালী রোদ সমস্ত রাজবাড়ীতে যেন সোনা ঢেলে দিল। শোকার্ত্ত মন্ত্রী গবুচন্দ্র তার সভাসদ, পাত্রমিত্র মৃত রাজার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এল। কিন্তু এ কী!

সবাই দেখলো হাসিখুশী মুখ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন রাজা হবুচন্দ্র শয়ন ঘরের দ্বারে।

[সুবিখ্যাত বিদেশী লেখক 'হ্যান্‌স ক্রিশ্চিয়ান অ্যাণ্ডারসনের' একটি বিখ্যাত গল্প 'দি নাইটিঙ্গেল' এর এর মূল ভাব নিয়ে লেখা হয়েছে এই রূপকাহিনী।]

অপরিচিত

বেদুইন

অরবিন্দ তখন মেডিক্যাল স্কুলের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। সামনে পরীক্ষা। বাড়ি এসেছে অরবিন্দ পরীক্ষার পড়া তৈরী করতে।

খবর নিয়ে এল বাড়ির ঝি মুনিয়ার মা। নীলমনি দত্তের ভাগ্নী রাধারাণী একটি পুত্র সন্তান প্রসব করেছে গত রাত্রে।

সংবাদটি শুভ। রাধারাণী অরবিন্দের বাল্যের খেলার সাথী। রাধারাণীর ষোল বছর পূর্ণ না হতেই বিয়ে দিয়েছে তার মাতুল নীলমনি দত্ত। অল্প বয়সে বিয়ে দেবার কারণ, রাধারাণীর বাবা-মা কেউ নেই। এককথায় দায়মুক্ত হতে রাধারাণীর বিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

রাধারাণীর বিয়ে যেবার হয় সেবার অরবিন্দ প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়েছিল। বিবাহটা একটা রুটিন ঘটনা। বিয়ের দিন অরবিন্দ খাটাখাটুনিও করেছে। অরবিন্দের মনে রাধারাণীর বিয়ের কোন ছাপ রাখতে পারে নি।

মেডিক্যাল স্কুলে পড়তে গিয়েই অরবিন্দ বিবাহ কি এবং তার তাৎপর্য কিছুটা বুঝতে শিখেছিল। রাধারাণীর মাতৃত্বলাভের সংবাদে অরবিন্দ কোন উৎসাহ বোধ করেনি।

হয়ত কোন সময়ই রাধারাণীর কথা সে মনেও আনত না কিন্তু নীলমণি দত্তের ব্যাকুল মুখের দিকে তাকিয়ে অরবিন্দ রাধারাণীকে দেখতে যেতে বাধ্য হল। নীলমণি দত্ত যতবারই রাধাণীর অসুস্থতার কথা বলে তার সাহায্য চেয়েছে ততবারই অরবিন্দ বলেছে—আমি তো ডাক্তার নই। ছাত্র মাত্র। আমি তো চিকিৎসা করতে পারব না। কোন পাশ করা ডাক্তারকে ডাকুন।

নীলমণি দত্ত তবুও জোর করেছে, বলেছে, পাশ করা ডাক্তার আছে, তবুও তুমি চল। রোগীর অবস্থা তো তুমি বুঝতে পারবে। তা হলেই চিকিৎসার ব্যবস্থা করব।

অগত্যা অরবিন্দ দেখতে গেল রাধারানীকে।

রাধারাণী প্রবল জ্বরে বেহুঁস হয়ে শুয়ে রয়েছে ছোট একটা ঘরে। নীলমণি দত্তের ব্যবস্থাপণায় অরবিন্দ সেই ঘরের সামনে বারান্দায় ইজিচেয়ার পেতে শুয়ে রইল। রাত বারটা নাগাদ রাধারাণীর জ্বরের বেশ কমতে অরবিন্দ নিশ্চিন্ত ভাবে ইজিচেয়ারে শুয়ে থাকতে থাকতে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

হঠাৎ ছু'টো শীতল হাত তার চোখের ওপর চেপে ধরতেই অরবিন্দের ঘুম গেল ভেঙ্গে। ধরমর করে উঠে বসবার আগেই কে যেন ফিস্ ফিস্ করে বলল, চুপ। জোরে কথা বলবেন না।

অরবিন্দ মুখ ফিরিয়ে দেখল রাধারাণীর মামাতো বোন নলিনী তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে।

অরবিন্দ জিজ্ঞাসা করল। তুমি এত রাতে ?

আমিতো রাধাকে নার্স করছিলাম। জ্বরটা কমেছে। বাইরে এসে দেখি আপনি ঘুমুচ্ছেন। বড়ই হিংসা হল। আমরা সারা রাত জেগে আছি। আপনি ঘুমোচ্ছেন। তাই ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিলাম।

অরবিন্দ গম্ভীর ভাবে বলল। ভাল করনি।

ভাল যে করেনি সেটা নলিনীও জানে। তখনকার মত দুজনেই থমকে গিয়েছিল। কিন্তু নলিনী থমকে গেলনা। প্রতিদিন দুপুর বেলায় নলিনীর কাজ হল অরবিন্দের পড়ার ঘরে হাজিরা দেওয়া। অবশেষে দেখা গেল। নলিণী সময় মত না এলে অরবিন্দও ছট্‌পট্ করত।

অরবিন্দ ফিরে গেল তার হোস্টেলে।

কদিন পরেই চিঠি পেল নলিনীর। সংবাদ সংক্ষিপ্ত, রাধারাণী মারা গেছে। এই খবরের শেষে অরবিন্দকে অনুরোধ জানিয়েছিল। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গ্রামে ফিরে আসতে।

অরবিন্দ জবাব দিয়েছিল।

মাসের পর মাস চিঠি চলাচল করতে থাকে। চিঠির মাধ্যমে ঘণিষ্ঠতাও গভীর হতে থাকে।

ফ্যাইন্যাল ইয়ারে নলিনী প্রস্তাব দিল। অরুদা, এবার আমার ঘর সাজাবার পালা।

অরবিন্দ প্রথমে বুঝতে পারেনি। বলল, কবে কোথায় ?

সেটাই তো জানতে চাই। কবে তোমার সুবিধা হবে ?

অরবিন্দ চিন্তিত হয়ে বলল। আমি যে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পরিনি!

আর কটা মাস পরে তো পারবে।

তোমার মামা রাজি হবেন কি?

না হতেও পারে। তার মত পাব না জানি। তাই ভাবছি।

কি ভাবছ?

ভাবছি তোমার হাত ধরে বেড়িয়ে পড়ি।

আমাকে একটু ভাবতে দাও নলিনী। দায়িত্ব নেবার মত ক্ষমতা আমার নেই। তার চেয়ে আরও দু একটা বছর অপেক্ষা করতে পার না কি?

না। এখনই যদি না আমরা ঘর বাঁধি তা হলে আমার ভবিষ্যত খুব সুখের হবে না।

ছটা মাস অপেক্ষা কর।

নলিনী দীর্ঘস্বরে বলল। ছ মা—স—স্! দেখি!

অরবিন্দ ফিরে গেল হোস্টেলে। চার মাস দুজনের দেখা সাক্ষাৎ নেই। আগামী মাসেই ফ্যাইন্যাল পরীক্ষা আরম্ভ। বই কেতাব হাসপাতাল আর ছুরি-কাঁচি নিয়ে তার দিন কাটছে। এমন সময় নীলমণি দত্তের চিঠি পেল নলিনীর বিয়ে তেসরা মাঘে। অরবিন্দর কেমন গোলমাল হয়ে গেল।

নলিণী কি স্বেচ্ছায় এই বিয়েতে মত দিয়েছে? নিশ্চয় নয়। যাচাই করা দরকার। অরবিন্দ শহর থেকে গ্রামে ছুটে এল। নিভৃতে দেখা হল দুজনের।

তুমি কি স্বেচ্ছায় বিয়ে করছো?

নলিণী জবাব দিল, হাঁ তুমি কবে নিজের পায়ে দাঁড়াবে, আর আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব। এতো হতে পারে না।

অবাক হয়ে গেল অরবিন্দ।

কথাটা মিথ্যা নয়। কবে সে নিজের পায়ে দাঁড়াবে আর নলিনী এসে ঘর বাঁধবে, এতো হতে পারে না। মাথা নীচু করে বিনাবাক্য ব্যয়ে অরবিন্দ ফিরে গেল হোস্টেলে।

আরও বিশ বছর কেটে গেছে।

অরবিন্দ কোন সময়ের জন্যই নলিনীকে ভুলতে পারেনি। মাঝে মাঝে তার সংবাদ পেতে আগ্রহ জন্মায়। কিন্তু খবর পাওয়ার কোনসূত্রই তার

ছিল না। মনে মনে ভাবেছে, নলিণী সুখে থাকলেই তার সুখ।

দেশ ভাগ হল।

জোয়ারের জলে ভাসতে ভাসতে কে কোথায় হারিয়ে গেল। অরবিন্দও উত্তরবঙ্গের কোন একটা ছোট শহরে এসে প্রসার জমিয়েছে। এমন সময় একদিন একজন রুগী এল। তার সঙ্গে কথা বলতে বলতে জানতে পারল নলিণীর সঙ্গে তার পরিচয় আছে। দূর সম্পর্কে সেও নাকি নলিনীর ছোট ভাই। নলিনী এই শহরের অমুক পাড়ায় রয়েছে। বোধ হয় ভালই আছে। মাঝে মাঝে নলিনীদের বাড়ীতেও সে যায়।

অরবিন্দ আগ্রহী হল নলিনীকে চোখের দেখা দেখতে। সে জানতে চায় নলিনী সুখে আছে কি না!

সেই রুগীটার সঙ্গে একদিন দুপুরে হাজির হল নলিনীর বাড়ীতে।

অরবিন্দ বাইরে দাঁড়িয়ে রইল। তার রুগী ভেতরে গিয়ে খবর নিয়ে এল। নলিনী ঘাটে গেছে স্নান করতে। একটা ষোলসতের বছরের মেয়ে এগিয়ে এসে জানতে চাইল কোথা থেকে আসছে, কেন আসছে।

কোন জবাব দেবার আগেই অরবিন্দ লক্ষ্য করল, একটা বয়স্কা মহিলা ভেজা কাপড়ে জলভর্তি কলসী কাঁখে করে বাড়ির দিকে এগিয়ে আসছে।

মেয়েটা বলল, ওই যে মা আসছে।

রুগীটাও বলল, এই তো নলিনীদি।

নলিনী রোগীকে জিজ্ঞেস করল, কেরে শণ্টু?

শণ্টু হেসে বলল, চিনতে পারলি না, এ তো অরুদা, অরু ডাক্তার।

নলিনী অবাক হয়ে অরবিন্দের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, চিনতে পারলাম না তো। আপনার বাড়ি কোথায় ছিল?

অরবিন্দের স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল।

মৃদুস্বরে বলল, চিনতে যখন পারনি, আর চিনে কাজ নেই। চলুন শণ্টুবাবু।

কথা শেষ করেই শণ্টুর হাত ধরে টানতে টানতে অরবিন্দ ফিরতি পথ ধরল, একবার পেছনে তাকিয়ে দেখার ইচ্ছাও হল না।

নলিনীর কাছে অরবিন্দ আজ অপরিচিত।

মাটগুদাম থেকে কবরে

—আব্দুল জব্বার

'গফুর জমাদার কিদর হ্যায় ? এই লেড়কী, ইদর আও—ইদর আও…।'

রোশোনারার বুকের ভেতরটা ধড়াস ধড়াস করতে লাগল। ছুটে এসে মাকে টেনে নিয়ে গিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'মা, কাবলীওলা !'

গফুর জমাদার বলল, 'তাড়াতাড়ি মইটা আন।'

'আমার ভয় করছে কি আজরাইল চেহারা !' বলল রোশোনারা।

'হ্যাঃ ! তোকে খেয়ে ফেলবে, বল, বাবু বাড়ী নেই।'

রোশেনারা ভয়ে ভয়ে বাইরে বের হল। পাড়ার ছেলেরা জুটেছে কাবুলীওলাকে দেখে। বউ-ঝিউড়িরা উকি ঝুঁকি মারছে পাশের বাড়ীর দোরগোড়া থেকে।

মই আনতে গফুর জমাদার উঠে গেল মাটগুদামের ওপরে। মইটা তুলে নিল ওপরে। এখন নিশ্চিন্ত।

কাবুলীটা 'বাকুলে' এলো। চেঁচাতে লাগল, 'কাঁহা হ্যায় গফুর মিয়া, এ বিবি ...।'

'ও বাবা ! দাবার ওপরে উঠে আসে যে !' অস্পষ্টভাবে বিড়বিড় করে বলল গফুরের বিবি আস্‌মা খাতুন।

'এ লেড়কী, হামলোক জানতা হ্যায় গফুর মিয়া ভেরামে হ্যায়। কাঁহা হ্যায় ? রুপেয়া নিকালনে বোলো। এই গফুর কা বিবি—বাহার আও—নেহিতো হাম অন্দর মে ঘুস যায়ে-গা।'

আসমা খাতুন কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'নেই বাবা—ঘরে নেই।'

'দো-শো রুপেয়া লিয়া, পাঁচ মাহিনা হো গিয়া, সুদ দেতা নেহি—রুপেয়া নিকালো। গফুর এই গফুর, শালা উল্লু, হারামী কা বাচ্চা।'

আসমার এবার রাগ হল। বাড়ীভর্তি লোক। সবাই আমোদ দেখতে এসেছে। বলল, 'দেখো কাবুলী, গালাগালি করবে না। টাকা পাবে, টাকা নেবে। এখন সাহেব নেই চলে যাও…।'

'কেয়া বাত্ ?' কাবুলীওলা দোরগোড়ায় এগিয়ে এলো।

'বলি, তুমি গাল দিচ্ছ কেন ?' বলল আসমা খাতুন।

'তবে কেয়া, পিয়ার করবে ?' একচোখ দেখাল কাবুলীওলা।

'পিয়ার তোর মা-বোনের সঙ্গে কর গিয়ে। গাঁয়ে কি একটা মানুষও নেই গা, যে কাবলীটাকে বুঝিয়ে বলে দুটো কথা ? মেয়েলোকদের বেইজ্জত করে কথা বলবে কাবলীটা ?'

গফুরের চাচাত ভাই সামাদ বলল, 'টাকা নিলে দিতে হবে না ? মান-সনমান নিয়ে চাস্তো-ভাই তো খুব কোচা তুলিয়ে বাবু হয়ে ঘুরে বেড়ায়, মিটিংয়ে যায়, ফুলের মালা আনে ! তার চেয়ে 'জন-খাটা' ভাল ছিল। চটকলে তাঁতের কাজ করলেও এমন দেনায় পড়ত না।'

ঘরের মধ্যে ঢুকে এলো কাবুলীটা ; চারদিকে তাকাল। বিরাট একখানা সেল্ফ ভর্তি বই। বিছানায় কাগজপত্র আর কলম-চশমা পড়ে আছে। দেওয়ালে চক্চকে নতুন ঘড়ি। বিছানার একপাশে রেডিও। থালা, ঘটি ডাবর, জার্মান সিলভারের কতকগুলি হাঁড়ি। স্টীল ট্র্যাঙ্ক, চামড়ার সুটকেশ। তক্তাপোষটার চকচকে পালিশ, বাড়ে নকসাকাটা। হেঁট হয়ে বিছানার তলায় লক্ষ্য করল কাবুলী। দেখল গফুর জমাদার নেই। কিন্তু জিনিসপত্র আছে ঘরে।

হঠাৎ একটি তরুণ ছোকরাকে দোরগোড়ায় আর্বিভূ'ত হতে দেখা গেল। সে বলল, 'কি খবর ? গফুর সাহেব কোথায় ? এই বেটা কাবুলী—তুমি ঘরের মধ্যে কেন ? বেরিয়ে এসো।' তরুণটির কণ্ঠস্বরে রীতিমতো দৃঢ়তা।

কাবুলী সোজা হয়ে দাঁড়াল। বলল 'নেহি যায়ে গা গফুরকা জরুর মিল্না মাংতা।'

জোরে চেঁচিয়ে উঠল তরুণটি, 'আরে মূর্খ, জংলী পাহাড়ী কোথাকার ! বাইরে এসে সারাদিন টাকার জন্যে হত্যে দিয়ে পড়ে থাক। ঘরে কেন ? মেয়েমানুষের লোভ আছে বোধহয় তোর ?'

'নেহি বাবু, ই-বাত কেন বলছ ?'

'তবে, জানো তোমাকে আমি জেলে ঢোকাতে পারি, আমার নাম জানো ?'

কাবুলীটা বাইরে চলে এলো। একালের মস্তান ছেলেদের চেনে সে।

ছেলেটি বলল, 'আমার নাম ইকবাল আমেদ। নামকরা মস্তান আমি। বেলেল্লা গিরী করলে আজই তোমাকে আমি দোরস্ত করে দিয়ে যাব।'

'কেয়া বাত!' সোজা হয়ে দাঁড়াল কাবুলীটা। বলল, 'লেকিন বাবু হামার নাম ভি ইলাহি বক্স খাঁ আছে।'

'তুই যা যা—টাকা পরে পাবি। আমি তোকে দিয়ে দেব। না হয় হিসেব কর গিয়ে বাইরে সেই কদম গাছটার তলায় বসে। দিয়ে দিচ্ছি আমি।'

কাবুলীটা সরে গেল।

ইকবাল আমেদ উঠানের লোকগুলোকে বলল, 'সঙ তো চলে গেল! এখন কি দেখবে তোমরা? আমাকে? পাড়া-প্রতিবেশী? ছোঃ! আসলে কেউ কাউকে তোমরা ভালবাস না ঈর্ষা করো, তাল পেলেই পরস্পরে নিন্দে গাও। গফুর সাহেব কত উঁচু দরের লোক তোমরা জানো? প্রদীপের নিচে চিরকালই শালা অন্ধকার থাকে।'

লোকজন সবাই সরে গেল।

গফুর মাটগুদামের ওপর থেকে উঁকি মেরে দেখতে গেল। ইকবাল আমেদ ছেলেটি কিরকম দেখতে? কখনও আলাপ হয়েছে বলে তো মনে পড়ে না। এখন তার পক্ষে কি নামা উচিত হবে?

ছেলেটির আকস্মিক আবির্ভাবের মধ্যে অলৌকিকতা আছে বটে! টাকাও দিয়ে দেবে বলছে। কিন্তু কেন? রোশোনারাকে চোখ পড়েছে? যদি তাই হয় তবে মুসলমান ছেলে আছে...।

তাকে বলতে শুনল, 'এই মেয়েটা. তুই কোন ক্লাসে পড়িস রে?'

রোশোনারা বলল. 'নাইনে।'

'নাইনে, না লাইনে?'

'ওই হল?' হাসল রোশেনারা। মায়ের তোলাকরা শাড়ী পরে আছে সে অভাবের সময়।

'হুঁঃ! একটু চা খাওয়াও আমাকে। কাবুলীর দেনা! শালা জ্বালাতন!' বলল ইকবাল আমেদ।

আসমা খাতুন মুখ খুলল এবার, 'জানো তো বাবা, এই বাজারে পাঁচটা প্রাণী, কবিতা লিখে কি করে চলবে—চটকলে তার চেয়ে যদি একটা তাঁত চালানো কাজও করত...।'

ইকবাল এসে তক্তাপোষের ওপর বসল, বলল, 'আপনি বলছেন একথা? বাজার-দর চিরকাল এমনি থাকবে না কিন্তু গফুর সাহেবের কবিতা চিরকাল থাকবে। এই তো কবিতা লিখছিলেন ··আমি শুনেছি, এ-বছর নাকি গফুর সাহেবকে সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার দেওয়া হবে। দেশ জোড়া তাঁর নাম। তাঁর কত কবিতা আমার মুখস্থ!'

কবিতা আবৃত্তি করতে লাগল ইকবাল আমেদ। ছেলেটির যেমন রঙ, তেমনি স্বাস্থ্য। বড় বনেদি ঘরের ছেলে বলেই মনে হয়।

কিন্তু এটা কেমন হল, ভাবতে লাগল গফুর জমাদার। সে একজন নামকরা আধুনিক কবি হয়ে কিনা মাটগুদামের ওপরে লুকিয়ে বসে আছে কাবুলীর অপমানের ভয়ে মারের ভয়ে। যদি তার স্ত্রী বা মেয়ের গায়ে হাতই দিত? কি রকম যাচ্ছেতাই কাপুরুষ কাপুরুষ লাগছে এখন যেন তাকে। ওরা বলে ফেলবে না তো? কাবলীর সামনে যদিও বা নামা যায় কিন্তু ঐ শিক্ষিত ভদ্র ভক্তটির সামনে তো নামা যায় না। হঠাৎ এই কীর্তিটা করে বসা তার ঠিক হয় নি। থাকগে, এখন সে নেই তো। গরমে, ঝুল কালিতে নেয়ে গেলেও এখন আর নামতে পারে না। হদি হাঁচি পায় হঠাৎ তাহলেই মুস্কিল! জীবনের গন্ধরূপ কত বিশ্রী!···

রোশোনারা বলল, 'কাবলীটা ডাকছে আপনাকে।'

চুল ঝাঁকড়া, বেল-বটস্-পরা ইকবাল আমেদ একটা বই হাতে নিয়ে উঠে গেল পড়তে পড়তে অন্যমনস্কভাবে হাস্যকর অঙ্গভঙ্গি করতে করতে।

কাবুলী বলল, 'বাবু দোশো রুপেয়া লিয়া, মাহিনা কা বাত দশ রুপেয়া সুদ, পাঁচ মাহিনা হুয়া তিনশো রুপেয়া আবি্ দেনে হোগা।'

ইকবাল আমেদ পকেট থেকে ব্যাগ বার করল। রোশোনারা পায়ে পায়ে কাছে গেল তার। ইকবাল হঠাৎ বলল, 'এই, তোর চোখদুটো এরকম নীলাভ নাকি?—লে বেটা কাবুলী, দূর হ।'

কাবুলী ইলাহি বক্স টাকা নিয়ে সালাম জানিয়ে সাইকেলে চড়ে চলে গেল।

রোশোনারা বলল, 'আপনি সব দিয়ে দিলেন!'

'দিলাম তো। আমাদের টাকা-পয়সা আছে। একটা বড় মুদিখানা আছে, দুটো আইসক্রীম তৈরির কল আছে, একটা ব্রাস তৈরীর কারখানা

আছে। অনেক বাড়ি আছে, জমি আছে। তিনশো টাকা আমার কাছে কিচ্ছু না! একদিন কলকাতায় থিয়েটার দেখতে গেলেই ফুরিয়ে যায়। মনে জানলুম তেমন একটা স্ফূর্তি করে বেরিয়ে গেল।'

রোশোনারা তার মাকে সব কথা বলার পর আসমা খাতুন ঘরের মধ্যে এসে অনুচ্চকণ্ঠে ডাকতে লাগল স্বামীকে, 'ওগো, শুনছ, ছেলেটাকে দেখবে এসো, নাব না এবার…।'

'এই, চোপ!' তাড়া দিল গফুর জমাদার।

ফিরে এলো ইকবাল আমেদ, বলল, 'কই চা খাওয়াবেন না? আপনাদের এতবড় উপকার করলুম…।'

আসমা খাতুন মাথায় কাপড় দিয়ে পায়ের দিকে তাকিয়ে বলল, সপ্তাভর উনি কলকাতায় যান নি লেখা নিয়ে ব্যস্ত…।'

রোশোনারা নখ খুঁটতে খুঁটতে বলল, 'বাবা এখন একটা কাব্য নাট্য লিখছেন। একশো টাকা নাকি দেবার কথা আছে। রবীন্দ্রসদনে প্লে হবে নাকি কুড়ি দিন পরে।'

ইকবাল বলল, হুঁঃ! এখন আমি শুয়ে পড়লাম এই বিছানায়। গফুর সাহেব না এলে যাচ্ছি না। আমি কাবুলীর চাইতেও খারাপ। আসলে একটা কবিতার বই ছাপাব বলে এসেছি। টাকা তো তিনশো অ্যাডভান্স দিয়েই দিলাম। চাল নেই বোধ হয় আপনাদের!'

আসমা খাতুন দাবার ওপরে বসেছিল। আরো ছোট ছোট দুটো-তিনটে ছেলেমেয়ে তার পাশে। মাথা নাড়ল আসমা। না, চাল নেই।

'তাহলে কি খেয়ে থাকেন আপনারা?'

আসমা বলল, 'পুঁইশাক, পাটশাক, মোচা-ডুমুরের ঘণ্ট, কাল সন্ধ্যায় এক কেজি আটা এনেছিল…আমি এভাবে আর পারি না।' কেঁদে ফেলল এবার আসমা খাতুন। 'এত কষ্ট তবু ঘড়ি আর রেডিওটা বেচতে দিই না। সোনাদানা আমার বাপ যা দিয়েছিল গেছে বাবা। এবার সবই যাবে।'

সোজা হয়ে বসল ইকবাল আমেদ। ডাকল রোশোনারাকে, 'এই, এদিকে আয়। তোকে তো বেশ দেখতে ভাল। তোর নাম 'হুর' দেওয়া উচিত।'

হেসে সলজ্জভাবে কাছে এগিয়ে এলো রোশোনারা। ব্যাগ বার করে ঝেড়ে

ছেড়ে খুচরো টাকাগুলো মেঝেয় ফেলে দিল ইকবাল। বলল, 'আর নেই। তোল, ক'টাকা দেখ।'

আসমা চোখ মুছে হাসতে লাগলো মেয়ের টাকা কুড়োনো দেখে। তাদের খাবার আসবে তাহলে। ছেলেগুলো ভাত খেতে পাবে? গতরাত্রে সে গলায় দড়ি দিতে গিয়েছিল। ছোট দুটোকে রাখা যায় না, কাঁদে। কাঁদলে দোলায় নিয়ে বসতে হয়। সারারাত দোলায় বসে বসেই কেটে যায়।

গফুর মিয়ার ঘুম না হলে, চিন্তা-ভাবনার ব্যাঘাত হলে বকাবকি করে। খাওয়া হোক না হোক, ও থাকে অন্য মার্গে।

রোশোনারা বলল, 'এগারো টাকা।'

'আর নেই আমার কাছে। যা, ঐ নিয়ে চাল কিনে আন। আজ চলি আমি। ঠিকানা লিখে রেখে যাচ্ছি উনি যেন অবশ্য অবশ্যই দেখা করেন।'

আসমা বলল, 'হ্যাঁ বাবা, নিশ্চয়ই দেখা করবে। তা হ্যাঁ বাবা, তুমি যাবে এখন দুপুর বেলা?'

দাবায় বেরিয়ে এলো ইকবাল আমেদ। বলল, 'থাকব বলছেন? এই মেয়েটা'—হাত বেড় দিয়ে আদরের ভঙ্গিতে পিঠের দিক থেকে ধরল একবার রোশোনারাকে—তারপর বলল, তোকে যদি বিয়ে করি?' রোশোনারা লজ্জা পেয়ে খুশি হয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেল। ব্যাগ হাতে নিয়ে চলে গেল সে দোকানের দিকে। হালকা তন্বী মেয়ে। ওমর খৈয়ামের সাকীর মতো যেন। অভাব না থাকলে আরো কত রূপ লাবণ্য খুলত।

ইকবাল তার সাইকেলে উঠল।

তাকে 'আবার এসো বাবা'—বলে বিদায় দিয়ে এসে আসমা খাতুন ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখল তার স্বামী নামক উচ্চমার্গের সেই ব্যক্তিটি এখন মই বেয়ে ধীরে ধীরে নেমে আসছেন!

ঘামে নেয়ে গেছেন তিনি! আহা!

আসমা খাতুন বলল, 'শুনলে তো খবর, তুমি নাকি এবছর সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার পাচ্ছ।'

গফুর বলল, 'জানি। 'মাটগুদাম থেকে কবরে' বইখানা বেরুবার পর।'

বিলাসিয়া মার্ডার

চিরঞ্জীব সেন

মানুষ হত্যা করে ভাবে আমাকে কেউ ধরতে পারবে না বিশেষ করে সে যদি অতি উচ্চপদস্থ সরকারী অফিসার হয়। সে ভাবে ধরতে ত পারবেই না আর যদি জানতেই পারে যে আমি খুন করেছি তাহলে পুলিশ আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে সাহসই করবে না। কিন্তু হায়! তারা মুর্খের স্বর্গে বাস করে।

যারা লখনৌ গেছেন তারা সুন্দরী গোমতী নদীর ওপর একাধিক সুন্দর ব্রিজগুলি দেখেছেন। মেডিক্যাল কলেজের কাছে ব্রিজটি. সেই ব্রিজের ফুটপাথে গ্রীষ্মের এক রাত্রে এক আধা ভিখারি ঘুমোবার চেষ্টা করছিল।

আধা-ভিখারি এইজন্যে বললুম যে সেই ভিখারি মাঝে মাঝে পুলিশের ইন্‌ফরমারের কাজও করে। ভিখা রর নাম নটওয়ারলাল।

জুন মাস। ভীষণ গরম। যদিও মাঝে মাঝে নদী থেকে ফুরফুর· হাওয়া আসছে তবুও তা দেহ শীতল করতে পারছে না। নটওরলাল এ পাশ ও পাশ করছে, ঘুম আসছে না। রাত্রি বারোটা বেজে গেছে, রাস্তা ফাঁকা।

একটা মোটরগাড়ি এসে নটওরলালের খুব কাছে থামল। নটওয়ার ভাবে কি ব্যাপার? এতরাত্রে এখানে গাড়ি থামে কেন? সে আগ্রহী হয়, কিন্তু মটকা মেরে পড়ে থাকে, পিটপিট করে চেয়ে দেখে।

গাড়ির দরজা খুলে দু'জন লোক নামল তারপর পিছন দিকে লগেজ বুট খুলে বড় একটা কাঠের প্যাকিংকেস বার করল। লোক দু জন সেটি তুলে এনে ব্রিজের রেলিং টপকে নদীর জলে ফেলে দিল। তারপর তারা আবার গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিল। গাড়ি কিন্তু কয়েক গজ গিয়ে থেমে গেল। টায়ার ফেটে গেছে। ওরা আবার গাড়ি থামাল, জ্যাক বার করল, সঙ্গে বাড়তি টায়ার ছিল। পিছনের একটি চাকা বদলে ওরা গাড়ি চালিয়ে চলে গেল।

ওরা চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নটওয়ারলাল থানায় ছুটল। নিজের চোখে যা দেখেছে তা বলল। পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে এল কিন্তু রাত্রিবেলায় জলে বাক্স দেখতে পেল না। যা করবার কাল সকালে করা যাবে বলে চলে গেল তবে যাত্রার আগে একটা কাজ করে গেল।

গাড়ি যেখানে প্রথমে দাঁড়িয়েছিল সেখানে চাকার খুব ভাল ছাপ পড়েছিল। পুলিশ টায়ারের সেই ছাপের প্লাস্টারের ছাঁচ তুলে নিল। যেখানে ওরা টায়ার পালটেছিল সেখানে একটি লোহার বল্টু পাওয়া গেল। সেটিও তারা তুলে নিল। পুলিস ভাগ্যি এই কাজটি করেছিল নইলে আসামীকে ধরতেই পারত না।

পরদিন সকালে পুলিস জাল সমেত জেলে এবং ডুবুরি নিয়ে এল। নদীতে জাল ফেলা হল, ডুবুরিও ডুবল কিন্তু জল থেকে কিছুই উঠল না। পুলিস তখন বিরক্ত হয়ে নটওয়ারলালকে গাল দিতে দিতে চলে গেল. বলে গেল, তুই ব্যাটা স্বপ্ন দেখছিলি।

কি বলছেন হুজুর? আমি ঠিকই দেখেছি, ওরা বাক্স ফেলেছে আর সে বাক্স জলেই আছে।

নটওয়ারলালের কথাই ঠিক হল। বাক্সটা যেখানে ফেলা হয়েছিল সেই ব্রিজ থেকে দূরে তাকে পাওয়া গেল, বাক্সটা জলের ওপরে উঠছে, ডুবছে। বাক্সটা বন্ধ ছিল, ভেতরে লাস পচে গ্যাস উৎপন্ন হয়ে বাক্স ভেসে উঠেছে। ভীষণ দুর্গন্ধ।

বাক্স খুলতেই একটি সুন্দরী যুবতীর মৃতদেহ বেরিয়ে পড়ল তবে লাস বেশ পচেছে। যুবতীর পরনে দামী সিলকের শাড়ি ও সায়া, গায়ে জরির কাজ করা ব্লাউস. হাতে সোনার চুড়ি, নাকে হীরে বসানো নাকছাবি। চেহারা ও গায়ের ফর্সা রং এবং পরনের শাড়ি ব্লাউস ও স্বর্ণালংকার দেখে মনে হয় বেশ বড় ঘরের মেয়ে তবে হাতে, গালে ও নাকে উলকি দেখে মনে হয় মেয়েটি ব্রাহ্মণ কায়স্থ জাতীয় উচ্চ সম্প্রদায়ভুক্ত নয়।

বাক্সর ভেতর পেরেকের ডগা যুবতীর দেহে কয়েক জায়গায় আঘাত করেছে, চামড়া ছিঁড়ে গেছে, বাঁ হাতের বাহুতে একটা সরু পেরেকের ডগা আটকে ছিল।

পুলিস সেই সরু পেরেকের ডগাটি বার করে রেখে দিল তারপর তার

দেহ থেকে সমস্ত অলংকার, শাড়ি, সায়া, ব্লাউস ইত্যাদি খুলে রেখে তালিকা তৈরি করা হল। ইতিপূর্বে সনাক্তকরণের জন্যে তার ফটো তোলা হয়েছিল।

এইবার ময়না তদন্তের জন্যে লাস পাঠান হল। প্যাকিং কেসটিও রেখে দেওয়া হল। খোঁজ করতে হবে এই প্যাকিং কেস কোথা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

ময়না তদন্ত করে জানা গেল যুবতীর বয়স প্রায় বাইশ, পাঁচ মাস গর্ভবতী, গর্ভে কোনো ত্রুটি নেই। শরীরের বাইরে বা ভেতরে কোনো আঘাতের চিহ্ন নেই, মৃত্যুর কোনো কারণই জানা গেল না। শ্বাসরোধ বা বিষ খাওয়ানোর কোনো লক্ষণই নেই অথচ কোনো সন্দেহ নেই যে মেয়েটিকে হত্যা করা হয়েছে নচেৎ লাস প্যাকিং কেসে ভরে গোপনে রাত্রে নদীর জলে ফেলে দেওয়া হত না। কিন্তু হত্যার কারণও জানা যাচ্ছে না।

পুলিস তখন টায়ারের সেই প্লাস্টারের ছাচ, ফটো, বল্টু এবং যুবতীর বাম বাহুতে পাওয়া সেই সরু পেরেকের টুকরো এবং শাড়ি সায়া ও ব্লাউসের টুকরো ফোরেনসিক বিজ্ঞানীর কাছে পাঠিয়ে দিল এবং ইতিমধ্যে তারা প্যাকিং কেসের উৎস খুঁজতে লাগল, থানায় থানায় খোঁজ করতে লাগল কোনো নিরুদ্দিষ্ট যুবতীর জন্যে কেউ ডায়েরি করেছে কি না।

ফরেনসিক বিজ্ঞানী ময়না তদন্তের রিপোর্ট চেয়ে পাঠালেন। ময়না তদন্ত যিনি করেছেন তিনি একজন অভিজ্ঞ ডাক্তার। তাঁর রিপোর্টে কোনো ত্রুটি নেই।

ফরেনসিক বিজ্ঞানী বোধহয় অকুল সাগরে পড়লেন। ময়না তদন্তের রিপোর্ট তাঁকে কোনো সাহায্যই করতে পারছে না। কিসে বা কিভাবে মৃত্যু হল ডাক্তার তা খুঁজে বার করতে পারেন নি, অস্বাভাবিক কোনো লক্ষণই পাওয়া যায় নি। প্লাস্টারের ছাঁচ, বল্টু আর ভাঙা পেরেক থেকে কি পাওয়া যাবে।

তবুও চেষ্টা করতে হবে এবং সেই ফরেনসিক বিজ্ঞানী অসাধ্য সাধন করলেন এবং হত্যাকারীকে দেখে ত পুলিস স্তম্ভিত!

প্রথমে টায়ারের প্লাস্টারের ছাঁচ ও মাপ দেখে নিশ্চিত হলেন যে এটি মিশেলিন টায়ারের ছাপ এবং এই মিশেলিন টায়ার ভারি গাড়ির চাকায় ব্যবহৃত হয়। মিশেলিন টায়ার ফ্রান্সে তৈরি হয় এবং প্রধানতঃ ফ্রান্সে তৈরি

গাড়িতে ব্যবহার করা হয়। টায়ারের মাপ দেখে তিনি বুঝলেন যে এই টায়ার ২৫ হর্স পাওয়ার গাড়িতে লগানো ছিল।

তখন ভারতে কয়েকরকম ফরাসি গাড়ি যথা সিত্রোয়াঁ, পিউজিও, রেনো, ডিলাজ এবং ডেলাহি পাওয়া যেত। প্রথম দু'টি হালকা ও ছোট গাড়ি তাতে ঐ ৬·৫ ইঞ্চি মাপের টায়ার থাকবার কথা নয়। বাকি দুটি বেশি দামী গাড়ি, লখনৌতে আছে কিনা তিনি জানেন না। ওটা পুলিসের কাজ, পুলিস খোঁজ করবে। তবে রেনো খুব দামী গাড়ি নয় ওর ছোট বড় মডেল উত্তর প্রদেশে আছে। রেনো গাড়ির একটা ২৫ হর্স পাওয়ার মডেলও আছে তবে দেখতে হবে সেই বিশেষ গাড়িতে মিশেলিন টায়ার ফিট করা আছে কি না।

সেই বল্টু পরীক্ষা করে এবং তার গায়ে খোদিত কিছু চিহ্ন দেখে ধরা গেল যে এটিও ফরাসি গাড়ির যন্ত্রাংশ, বোধহয় টায়ার বদল করবার সময় খুলে পড়েছিল। সেই বল্টুর ওপর ইংরেজি 'আর' অক্ষর কোদিত ছিল, এবং অক্ষরের নিচে 'টলেডো' কথাটি খুব ছোট অক্ষরে খোদিত ছিল। টলেডো শহরে মোটরের বহুরকম যন্ত্রাংশ তৈরি হয় আর সেই যন্ত্রাংশ যে গাড়িতে ব্যবহার করা হবে সেই গাড়ির প্রথম অক্ষরের নাম খোদাই করা হয়। এই বল্টুতে লেখা ছিল 'আর'। যদিও 'আর' অক্ষর দিয়ে আরম্ভ অনেক গাড়ি আছে যেমন রোলস রয়েস, রোভার, রোমার, র‍্যাম্বলার, অ্যালফা-রোমিও কিন্তু টলেডোতে তৈরি যন্ত্রাংশ ফরাসি গাড়িতেই ব্যবহৃত হয়। ওপরের কোনো গাড়ি ফ্রান্সে তৈরি নয়। অতএব এই বল্টুটি রেনো গাড়ির। বল্টুর ও টায়ারের মাপ বলে দিচ্ছে যে এই দু'টি ২৫ হর্স পাওয়ার রেনো গাড়ির। বর্তমানে এই বল্টু ভারতে পাওয়া যায় না। পুলিস যদি সেই রেনো গাড়ি ধরতে পারে তবে তাতে নিশ্চয় এই বল্টুটি থাকবে না। যদি কোনো বল্টু পরে লাগানো হয়ে থাকে তবে তা অন্য কোনো দেশে বা ভারতে প্রস্তুত। একটি মোক্ষম প্রমাণ পুলিশের হস্তগত হয়েছে।

গাড়ি ত না হয় ধরা গেল কিন্তু যুবতীকে যে গাড়ির মালিকরা খুন করেছে সেই আসল ব্যাপারটা ত বার করতে হবে এবং চাই প্রমাণ।

ফরেনসিক বিজ্ঞানী এবার মনোনিবেশ করলেন সেই ভাঙা ও সরু পেরেকের ডগাটির দিকে। লেনসের তলায় ধরে দেখলেন সেটি মোটেই

পেরেক নয়. ষ্টীলের তৈরি খুব সরু টিউবের ছুঁচলো মুখ। ছুঁচলো মুখে সূক্ষ্ম ছিদ্র রয়েছে।

এটি আর কিছুই নয়, একটি বড় আকারের হাইপোডারমিক সিরিঞ্জের নিডল্-এর ডগা। এত বড় হাইপোডারমিক সিরিঞ্জ ত পশু চিকিৎসকরা ব্যবহার করে। সাধারন ডাক্তাররা ব্যবহার করে না, করলেও তাদের হাতে ছুচ ভাঙে না, ভাঙে আনাড়ি হলে কিংবা যাকে ইঞ্জেকশন দেওয়া হচ্ছে সে যদি বাধা দেয়। তাহলে এক্ষেত্রে যে ইঞ্জেকশন দিয়েছে সে আনাড়ি এবং যুবতী বাধা দিয়েছে।

কি ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়েছিল? তার কি কিছু চিহ্নও পাওয়া যাবে এখন? নিশ্চয় এমন কোনো বিষ যা স্বাস্থ্যবতী ও সুস্থ যুবতীর মৃত্যু ঘটিয়েছে। ফরেনসিক বিজ্ঞানীব বাহাদুরী আছে। তিনি কি সব কেমিক্যাল রি-এজেণ্ট প্রয়োগ করে সেই সরু ছুঁচের ডগায় যে তীব্র বিষের অস্তিত্ব টের পেলেন তার নাম নক্সভমিকা বা কুচিলা।

এবার ডাক্তারবাবু পোস্টমর্টমের রিপোর্টখানা আর একবার পড়লেন। কুচিলা বিষ প্রয়োগে মৃত্যু হলে হার্ট, লাংস, লিভার, প্লীহা, কিডনির যে অবস্থা হতে পারে তা মিলে গেল।

ফরেনসিক বিজ্ঞানীর রিপোর্ট পড়ে জানা গেল যে ২৫ হর্স পাওয়ার রেনো গাড়ির মালিক হেভি ডোজ কুচিলা ইঞ্জেকশান দিয়ে যুবতীকে হত্যা করেছে। পুলিশ অনুমান করল ঐ যুবতী সম্ভবতঃ কোনো ভদ্র বংশের নয় যদিও তার পরনে দামী শাড়ি ও দেহে সোনার গয়না ছিল কিন্তু উলকি চিহ্ন দেখে মনে হয় যে সে সম্ভবতঃ বারবণিতা বা বহুবল্লভা।

ফরেনসিক বিজ্ঞানী তাঁর কাজ শেষ করে রিপোর্ট দিলেন। এবার পুলিসের পালা। ২৫ হর্সপাওয়ারের রেনো গাড়ি খুঁজে বার করতে পুলিসের পক্ষে মোটেই কঠিন হল না। গাড়ির মালিক হলেন লখনৌ বিভাগের কমিশনার মিঃ বি বি সিং যিনি বাদশাবাগে বাগান ঘেরা বিরাট বাংলোয় থাকেন।

টায়ারের ছাপ ত মিললই এবং বিশেষ বল্টুটিও গাড়িতে ছিল না। মৃতদেহের ছবি সনাক্ত করল কমিশনারের মালী ছেদীলাল। মালী বলল,

এ ছবি তার বিধবা কন্যা বিলাসিয়ার। বিলাসিয়া কমিশনার সাহেবের মেয়ের আয়ার কাজ করত।

বিলাসিয়া ত সাহেবের বাংলোয় রাতদিন থাকত, বাবার সঙ্গে দেখা হত খুব কম তাই তার মেয়ে আছে কি গেছে সে জানত না। মেয়ের বয়স তেইশ, সত্যিই সে খুব সুন্দরী ছিল। তবে মেয়েটা কম বয়সে বিধবা হয়ে খারাপ হয়ে গিয়েছিল কিন্তু সাহেবের কাছে চাকরি পাওয়ায় ছেদীলাল নিশ্চিন্ত হয়েছিল।

কমিশনার মিঃ সিং-এর বৌ স্বামীকে ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন তবে তার ছোট মেয়ে কমিশনার সাহেবের কাছে রয়ে গিয়েছিলেন। সেই মেয়ের জন্যেই বিলাসিয়াকে আয়া নিযুক্ত করা হল।

আয়ার রূপ দেখে ত কমিশনার অবাক। এর পাশে ত তার বৌ দাঁড়াতেই পারে না। ফল যা হবার তা হল। বিলাসিয়া অন্তঃসত্ত্বা হল। কমিশনার চাইল ত. নষ্ট করতে। বিলাসিয়া রাজি নয়। একটা বাচ্চা সে রাখবে। কিন্তু কমিশনার তা শুনবে না। গর্ভনাশের জন্যে কয়েকটা ওষুধও প্রয়োগ করল, ফল হল না। কে যেন বলল কুচিলা ইঞ্জেকশান দিলে অ্যাবরশন হয়ে যাবে। কমিশনার আনাড়ী হাতে নিজেই ইঞ্জেকশান দিতে গেল, বিলাসিয়া ঝটাপটি করেছিল ছুঁচ ভেঙে গেল কিন্তু ততক্ষণে যা হবার তা হয়ে গেছে। হতভাগিনী মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল।

কমিশনার মিঃ সিং-এর বাড়ি সার্চ করা হল। ভাঙা ছুঁচওয়ালা সেই হাইপোডারমিক সিরিঞ্জও পাওয়া গেল। কমিশনার সাহেব গ্রেফতার হলেন। বিচার হল কিন্তু তিনি ছাড়া পেয়ে গেলেন।

৩০২ আই পি সি ধারা অনুসারে তার বিরুদ্ধে হত্যার অপরাধ আনা হয়েছিল কিন্তু এই ধারায় আসামীকে সাজা দিতে হলে হত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষ সাক্ষী থাকা চাই। সেরকম কোনো সাক্ষী পাওয়া যায় নি এবং প্যাকিংকেস ফেলতে দেখলেও মৃতদেহ কেউ জলে ফেলতে দেখে নি। অতএব কমিশনার সাহেব ছাড়া পেয়ে গেলেন। তিনি আবার চাকরিতে বহাল হলেন। তবে তাঁকে অন্য বিভাগে বদলি করা হল।

এরপরই ট্র্যাজেডি।

এক মাসের মধ্যে মিঃ সিং এর পত্নী আফিম খেয়ে আত্মহত্যা করলেন। আর পনের দিনের মধ্যে কমিশনার বি বি সিং স্বয়ং মাথায় গুলি করে আত্মহত্যা করলেন।

মৃত্যুর আগে কমিশনার চিঠি লিখে বিলাসিয়ার সমস্ত ব্যাপারটাই স্বীকার করে গিয়েছিলেন।

চিঠিখানা তিনি লিখেছিলেন তাঁর বন্ধু পুলিসের ডি আই জি-কে। তিনি লিখেছিলেন, 'বিলাসিয়াকে আমি সত্যসত্যই ভালবেসে ফেলেছিলুম, শুধু কামচরিতার্থ করবার জন্যেই নয়, নিজের পত্নীর মতোই ভালবাসতুম। কিন্তু সাবধান হওয়া এবং প্রতিরোধ ব্যবস্থা নেওয়া সত্বেও বিলাসিয়া গর্ভবতী হয়ে পড়ল।

আমি বিলাসিয়াকে বললুম, ওটি নষ্ট করতে হবে নচেৎ সমাজে আমার অত্যন্ত দুর্নাম হবে। অভিজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যেতে চাইলুম। বিলাসিয়া ডাক্তারের কাছে যেতে কিছুতেই রাজি নয় এবং বাচ্চাটাকে রাখতে চায়। কোনো কথাই সে শুনবে না।

অগত্যা আমাকে ছলনা ও হাতুড়ে বৈদ্যদের পরামর্শ অনুসারে কাজ করতে হল কিন্তু কোন ফলই হল না। তখন একজন পরামর্শ দিল স্ট্রীকনিন ইঞ্জেকশন দিতে। আমি নিজের হাতে জোর করে সেই ইঞ্জেকশান দিলুম। বিলাসিয়া প্রবল বাধা দিয়েছিল যার ফলে নিডলের ডগা ভেঙে গিয়েছিল। এবার ফল হল কুফল। বিলাসিয়া মরে গেল। যা কেলেংকারী হবার তা হলই। আমি কিন্তু বিলাসিয়াকে ভুলতে পারছিনা। তাকে এত ভালবাসতুম আর আমারই হাতে তার মৃত্যু হল। বেঁচে থেকে আমার কি লাভ। মরণের পর হয়ত বিলাসিয়ার সঙ্গে আমার মিলন হবে। আমি তারই কাছে চললুম।"

প্রগতি সাহিত্য

—অধ্যাপিকা আরতি গঙ্গোপাধ্যায়

প্রগতি সাহিত্যের কোনো একটা নির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া খুবই শক্ত। কারণ প্রগতি কথাটা যেমন চলমান, তেমনি এই চলমানতার কোনো স্থাবর সংজ্ঞা দিয়ে তাকে চলচ্ছক্তিহীন করা সম্ভব নয়। কিছুদিন ধরে বাংলা সাহিত্যে প্রগতি নামে যে পাশ্চাদ্গতির ধারা সাহিত্যকে ক্রমশঃ বিবরমুখী করে তুলেছে তাতে প্রমাণিত হয় 'প্রগতি' কথাটার ব্যবহার আক্ষরিকভাবে সর্বদা ব্যবহৃত হয় না।

সাহিত্য সমাজের দর্পণ, এটা প্রচলিত উপমা। দর্পণে ছায়াই প্রতিবিম্বিত হয় যা স্থায়ী নয়। সাহিত্য ঠিক প্রতিবিম্ব নয়, তা বাস্তব। সমাজের জমিতে তার শিকড় গাঁথা আছে। সমাজই জোগান দেয় তার খাদ্য এবং সৃষ্টি করে তার রূপ। ভূ-বৈজ্ঞানিক যেমন গাছের চেহারা দেখে সন্ধান পান তার মাটির স্তরে কোন্ খনিজ পদার্থ আছে। তেমনি সাহিত্যের চেহারায়ও আভাস পাওয়া যায় আভ্যন্তরীণ সমাজ মানসের।

সমাজের ভিত্তিই হলো অর্থনীতি। বিশেষ ধরণের অর্থনৈতিক বণ্টন ব্যবস্থা সমাজের বিশেষ রূপ দেয়। তার ফলেই আমরা দেখি যে, যে সমাজ ব্যবস্থায় রাজশক্তি বা সামন্তশক্তি সর্বব্যাপী সেখানে রাজশক্তি বা দৈবশক্তির প্রাধান্য জ্ঞাপক গালগল্প বা রূপকথা, বাস্তবের রাজাকেও রূপকথার স্তরে নিয়ে যেতে সঙ্কোচ করে না। ইংল্যাণ্ডে রাজা আর্থারের কাহিনীর মতো আমাদের মহাকবি কালিদাস রচিত রঘুবংশ বা শকুন্তলা নাটকও এ ধরণেরই উদাহরণ। সমুদ্রগুপ্তের বিজয় অভিযান, রাজা রঘুর বিজয় অভিযানের মধ্যে রূপায়িত, আবার দুর্ব্বাসার শাপের অতিদুর্বল অজুহাতে কীভাবে রাজা দুষ্মন্তের লাম্পট্য আড়ালে চলে গেছে উপরন্তু মহৎ ও মহাবীর রূপে তিনি দেদীপ্যমান হয়ে উঠেছেন, একটু চিন্তা করলেই তা ধরা যায়। যুগান্তব্যাপী অন্ধতা আমাদের যুক্তিবোধকে কীভাবে যে এড়িয়ে যেতে পারে, তা সহজে উপলব্ধি করা যায় না।

ধনবণ্টনের ক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যবস্থা যেখানে কেবল রাজশক্তির নিকট আত্মসমর্পিত, সে যুগের বাস্তব অবস্থা সাহিত্যে সৃষ্টির স্বর্ণযুগ ঘটিয়েছে। কারণ সাহিত্যিকরা পরজীবী হয়ে অপূর্ব শোভা সম্পদে বিকশিত অর্কিডের মতো রাজপ্রাসাদের মধ্য থেকে প্রাণরস আস্বাদন করে এসেছিল। সারা পৃথিবীর সাহিত্য ও শিল্প সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ যুগই ছিলো যখন রাজা ছিলেন শীর্ষে।

এ অবস্থার প্রথম পরিবর্তন এলো ধনতান্ত্রিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে য়ুরোপখণ্ডে। ধনতন্ত্রের যুগে রাজতন্ত্র ক্ষয়িষ্ণু এবং 'ব্যক্তি' কোনো প্রকার দৈব প্রসাদ নিরপেক্ষ ও আত্মসচেতন। সুতরাং এ যুগে সাহিত্য ক্রমশঃ আত্মমুখী ও জীবনমুখী হয়ে উঠেছে। প্রকৃতিগতভাবে এই সাহিত্যকেই বুর্জোয়া সাহিত্য নামে অদ্যাবধি অভিহিত করা হয়ে থাকে।

বুর্জোয়া কথাটা আক্ষরিক ভাবে 'মধ্যবিত্ত' অর্থাৎ রাজকীয় মর্যাদা সম্পন্ন নীলরক্তবান অভিজাতের বিপরীত। আভিজাত্যের নীলরক্ত যে স্বপ্নলোককে বাস্তব প্রতিম করে উপস্থাপিত করে রেখেছিল, সেই স্বপ্ন জগতের পরিপার্শ্বে হঠাৎই এই আত্মচেতনার সূর্য্যালোক এসে পড়ায় প্রথম থেকেই তার শুভ আবাহান ঘটে নি। কিন্তু কালক্রমে তার মধ্যে এক গূঢ় প্রাণ প্রবর্তনা তাকে যে পথে পরিচালিত করে, তা অদ্যাবধি এক বিশাল নদীস্রোতের মতই প্রবহমান। এই প্রাণ প্রবর্তনার উৎস অর্থনৈতিক ব্যবস্থারই অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব যা ধনতন্ত্রের মধ্যে স্বতঃ উদ্ভূত।

ধনতন্ত্রের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব একদিকে যেমন ধনিক শ্রেণীর সৃষ্টি করছে, যে ধণিক শ্রেণী নিজের সার্থকতার মদকর উন্মত্ততায় লাভের অংক বাড়াবার স্বপ্নে বিভোর এবং পৃথিবীকে করতলগত করার অসম্ভব আকাংক্ষায় কম্পমান, অপর দিকে তা শ্রমিক শ্রেণীরও সৃষ্টি করছে, যার শক্তিই তার প্রচণ্ড আশ্রয় এবং ভিত্তি। একদিকে সেই জন্য এই বুর্জোয়া সাহিত্য ব্যক্তিসচেতন আত্মকেন্দ্রিক এবং সর্বাতিশায়ী প্রবল আগ্রহে যে অন্যের ব্যক্তিত্বের প্রতি তীব্র অনীহা প্রকাশ করছে, অপর দিকে তারই মধ্যে আত্মপ্রকাশ করছে সর্বাঙ্গীন মানবতার প্রতি শ্রাদ্ধাব্যাপক জনজীবনের প্রতি কৌতূহল এবং নূতন জীবনসত্যের উপলব্ধি। বুর্জোয়া সাহিত্য বলতে আমারা যা বুঝি তা হলো এই দুই প্রবর্তনার যুগপৎ উপলব্ধি, কিন্তু তার পরস্পর বিরোধী রূপ সম্বন্ধে সচেতনতা। এ যুগের প্রতিটি শিল্পীর ও প্রতিটি সাহিত্যিকের মধ্যেই

এই দুই রূপের দ্বন্দ্বের পরিচয় প্রকাশিত যার প্রভাব কীভাবে সাহিত্যিকের উপর পড়বে নির্ভর করে সাহিত্যিকের প্রকৃত শ্রেণী চেতনার উপর।

শ্রেণীচেতনা নির্ভর করে অর্থনৈতিক অবস্থার উপর। সব যুগেই আমরা তা দেখি। প্রাক্ সমাজতন্ত্রের ভাববাদী যুগে যখন 'যাদের আছে' ও 'যাদের নেই' এর দ্বন্দ্বই প্রধান বলে বিবেচিত হতো, তখনও সহজেই এই সমস্যার সমাধান ঘটেছে। আত্মবিক্রয়ে রাজি থাকলে 'যাদের নেই' বা অতি সহজেই 'যাদের আছে' দলে চলে যেতে পারতেন। আজও তাই। শ্রমিকের আছে একমাত্র বিক্রেয় বস্তু, তার শ্রমশক্তি কিন্তু শিল্পী বা সাহিত্যিকের আছে একাধিক বিক্রেয় বস্তু, তার শ্রম ও তার মস্তিষ্ক, বলা যায় 'বেণীর সঙ্গে মাথা'। শ্রমিক তার মস্তিষ্ক বেচতে বাধ্য নয় কিন্তু মস্তিষ্ক বজায় রেখে কলম বেচা যায় না, একথা সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত সত্য।

সেইজন্যই শ্রেণীদ্বন্দ্ব যতই তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে, ততই মুস্কিল হয় মস্তিষ্কজীবীর। প্রগতি সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে এই তীব্র দ্বন্দ্বের অবস্থাটাই মারাত্মক। পদে পদে মস্তিকজীবীকে সচেতন থাকতে হয়, কারণ শ্রেণীদ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে কোন পথে পা ফেলতে হবে তার বিচার নিজেকেই করতে হবে প্রতিমুহূর্তে। 'কলম তরবারির চেয়ে শক্তিশালী' কথাটা তাৎপর্যপূর্ণ হলেও কতটা সত্য, তা বাস্তব ক্ষেত্রে সদাসর্বদা প্রমাণিত হয় নি। প্রমাণিত হয়েছে তখনই, যখন সমাজের অগ্রগামী শক্তিগুলির পাশাপাশি মস্তিকজীবীরা এসে দাঁড়িয়েছে, এবং তখনই কলম তার প্রচণ্ড শক্তি প্রবর্তনা খুঁজে পেয়েছে।

আজকের জগতে প্রগতি সাহিত্যের স্বরূপ বিশ্লেষণ করা ক্রমশঃ কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে উঠছে। এক সময় 'নোবেল প্রাইজ' ছিলো সাহিত্য প্রতিভার শ্রেষ্ঠ স্বীকৃতি। আজকে প্রমাণিত হয়েছে 'নোবেল পুরস্কার' বিশেষ ধরণের সাহিত্য কৃতিত্বকেই পুরস্কৃত করে এবং তাও গভীরভাবে পূর্বপরিকল্পিত। সেজন্যই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি প্রাপ্ত 'নোবেল পুরস্কৃত' লেখকদের মধ্যে বর্তমানে তাঁদেরই সাক্ষাৎ পাওয়া যাচ্ছে, বুর্জোয়া সাহিত্যের শ্রেণী চেতনা যাঁদের দাঁড় করিয়েছে আত্মসর্বস্ব আত্মরতিমূলক বন্ধ্যা শিল্প সৃষ্টির আপাত সুন্দর বিষয় পরিবেশে। জীবনের বাস্তব, উজ্জ্বল, প্রখর চেতনাকে স্বীকৃতি দেওয়া এখন ভয়াবহ বলেই বিবেচিত, সে জন্য গোর্কীর মতো লেখককেও কখনো নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয় না, আন্তর্জাতিক সর্বজনস্বীকৃতি

থাকলেও, পুরস্কৃত করা হয় Sanl Bellow বা Issac Sizer কে বাদে। রচনায় 'মরবিড' বিষাদ করুণ আত্মনিগ্রহের যন্ত্রণা, যার প্রতিকার থাকলেও লেখক নিজে যার প্রতি সম্পূর্ণ উপেক্ষাশীল।

সমাজতন্ত্রী সাহিত্যের আবির্ভাব এই দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই ঘটে উঠেছে। যদিও সমাজতান্ত্রিক মূল্যবোধের সম্পূর্ণ আলংকারিক ব্যাখ্যা এখনও তৈরী হয়নি। কতিপয় সমালোচক এই কাজে অগ্রসর হয়েছেন; লুকাচ এর মতো অনেকেই এই সংজ্ঞা নির্ণয়ে ব্যাপৃত। আমাদের দেশে অবশ্য এখনও আমরা ঘুরপাক খাচ্ছি প্রগতি সাহিত্যের সংজ্ঞার অনিশ্চিতের মধ্যে, তার কারণও স্বয়ম্প্রকাশ। অর্থনৈতিক অব্যবস্থা একদিকে আমাদের সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় ধনিকশ্রেণীর হাত পাঙ্গু করে রেখেছে, অপর দিকে রাজনৈতিক চেতনার ঘোলাটে স্তর আড়াল করে রেখেছে শ্রেণীদ্বন্দ্বের প্রকৃত চেহারাটাকে। সে জন্যই আমাদের দেশের কতিপয় ভূতপূর্ব প্রগতি লেখক আজ সানন্দে আত্মবিক্রয় করে মূর্খের স্বর্গে বিরাজমান, উপরন্তু শোষক শ্রেণীরই সহায়তা করার প্রচণ্ড আগ্রহে কলম ধরেছেন, অথচ তার বিরোধী শক্তি এখনও যথাযথ ভাবে আত্মশক্তি সংহত করে আত্মপ্রকাশ করে উঠতে পারে নি। তবু, আশার কথা এই যে সাহিত্যের জীবনমুখী চেতনা আজও অব্যাহত, লেখক ও শিল্পীরা আজও যুঝে চলেছেন, এর মধ্য দিয়েই সমাজমুখী সুস্থ মনন ও সংস্কৃতি চিন্তা আত্মপ্রকাশ করার জন্য উন্মুখ। এই আসন্ন নবজাগৃতিকে আমরা সানন্দে সাগ্রহে আবাহন জানাচ্ছি।

"বলো 'জয় জয়' বলো 'নাহি ভয়'—কালের প্রয়াণ পথে
আসে নির্দয় নবযৌবনের ভাঙনের মহারথে।"

—রবীন্দ্রনাথ

অবেলায়

—অমীর বিশ্বাস

মাথাটা হঠাৎ ঘুরে যায়। সারা বুক জুড়ে অম্বল জাতীয় গ্যাস খাঁচা ঝাঁকিয়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। মুখ সিঁটকে, কণ্ঠনালী থেকে স্তনের শেষ প্রান্ত অব্দি বারকয়েক জোরসে ডলে নেয়। শিষ জাগানো ধানী মাঠে জল ঢোঁড়াকে কাঁকড়ায় কামড়ালে যেমন গুলটি পাকিয়ে পাক খেতে থাকে – তেমনি গাঢ় অন্ধকারের আধছাওয়া চালের নিচে দেয়াল সেঁটে মোচড় খেতে লাগল দুলী।

ধারাবাহিক ভাবনায় স্নেহের টানকে সে আঁচল থেকে ধুয়ে ফেলতে পারে না। কেলোর মুখ মনে পড়ায় যেন বড্ড বেশী পঙ্গু হয়ে পড়েছে। এখন টুকরো টুকরো স্মৃতি ভ্রমরের মতন তার চারপাশে ঘুরছে। কতদিন ধরে সে ছেলেটা বাড়ি ছাড়া, সেই কবে এসে দশটা টাকা দিয়ে বলে গেছে বাবু আসতি দেয় না। অথচ করনীয় নেই কিছু। এমনতরো সংসারে একা একা হাটে-বাজারের রাস্তা চিনলে কিছু পয়সার ধান্দা করতে হয়। এ কথা সামান্য হলেও দুলী নির্মমভাবে হজম করেছিল। শুধু এইটুকুন সান্ত্বনা—নতুন কিছু তো না।

নাই বা হোক। ক্যাওড়া-বাগ্দীদের কথার হেরফের হতে পারে, কিন্তু বাবুদের জবানী ঠিক থাকা চাই বটে। গতবার সে তো কচুসেদ্ধ বা গেড়ি চচ্চড়ির লোভে আসে নি। বরং শরীর নিংড়নো খাটনীর দাপটেই এসেছিল। ফিরে আসার কারণ জিজ্ঞেস করায় দুলী এই জবাব পেয়েছিল। আর আসেনি। অগ্রহনের প্রাক্কালে অস্ফুট, কাটাকাটা শব্দ বেড়িয়ে আসে—উঃ। এসবের মধ্যে কেলোর প্রসঙ্গ নিথর জলে হঠাৎ ঢেউ-এর মত মিলিয়ে যায়।

দুলীর দ্বিতীয় সন্তান পুচ্‌কে। শেষও বলা চলে। সে এখন খেলাধুলো, খোয়া-কেনা, ফুটো ঢোলকে ভুলে আছে। পুচ্‌কে ছেলের মতই অকাতর ঘুমে আচ্ছন্ন। কিন্তু খিদে তো আর ঘুমোয় না। আদ্দেক রাত্তিরে জেগে ওঠে। পেটটা ঠাণ্ডা আছে বলেই আজ তারস্বরে কাঁদছে না। দুলী

বিকেলে তার বিষণ্ণ দেহটা ছেলের ক'ড়ে আঙুলের সাহায্যে নতুন বাজার অব্দি টেনে নিয়ে গেছিল। সিঙ্গাড়া, নিমকি এমনকি দুই দুটো রসগোল্লা খাইয়েছে তাকে। ঘুপচি ঘরের একফালি বারান্দায় সকাল সকাল ঘুম যাচ্ছে। এবং খানিক আগে শুকো নেশা করে এসে বসে ঝিম দিচ্ছে।

মানুষ সহায় সম্বলহীন হলে সর্বশক্তি দিয়ে একটা অবলম্বন ধরতে চায়। অকূল পাথারে ভাসা এক টুকরো কাঠের মত। দুলী খুঁটিটা প্রাণপণে জাপটে ধরল। অচৈতন্য লাথিতে জলশূন্য ঠিলেটা হুমড়ি খেয়ে গড়িয়ে যাবার সময় কঞ্চি ঘেরায় মুরগীগুলো খাড়্‌মাড়্‌ সজাগ হয়ে উঠল। অথচ এইসব ধুনকো অভিজ্ঞতায় শুকোর কান যায় না। ধুনকীতে তার চোখের সামনে সারা পৃথিবীর গাছপালা, মানুষজন বাবার ডমরুর তালে তালে নাচছে।

এরই ভিতর দুলীর চিগরী ওঠে। পা দুটো ট্রেনে কাটা ধড়ের মতন ঝট্‌কাতে থাকে। ধড়াস ঠাস্‌। অবলা জীবেরা এবার জানান দেয়—কোঁকর কোঁ।

একটু ফরসাপানা হলেই মুরগী ডাকে, অথচ জ্যোস্না নেই। তাই সামান্য বিশ্রামের নিশ্চিত আশ্বাস ভেঙে শুকো হাঁক পাড়ে—কেডা রে? মেজাজটা বিরক্তিতে টইটম্বুর। অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠোনে আসতে মনস্থ করে। পা বাড়াবার পূর্বমুহূর্তে একটা কথাই মনে পড়ে যায় উচ্চারণগত ছোট্ট আঁকার নেয় শা—লা।

সিধে হয়ে দাঁড়ালে পুরো পাঁচ হাত্তি শরীর। বয়েস হলেও গায়ের চামড়া সাপের মত চিমসে যায়নি। ভোটার লিষ্ট অনুযায়ী নাম ছিল মণ্ডল সুকুমার। দিনমজুর বলে নিদেনপক্ষে শুকো ডাকটাই যথেষ্ট। যে জমির উপর দাঁড়িয়ে সে নেশার ভারে জর্জরিত তা দেড়ছটাক কম তিনকাটা। এবং সামনে পিছনে শনের ছাউনি দেয়া ঘর দুটো রোদ-বৃষ্টিতে হরদম ভেজে সেটাও তার ঘাম নিংড়নো পরিশ্রমের আশ্রয়। আবার সেই চাপা কাতরানীর শব্দ—আ-আ ... এবার সত্যি সে চমকে উঠলো। গোঙানীর শব্দে সন্দেহটা পারদের মত বাড়তে থাকে।

যে সময়ে দুলীর কাণ্ডকারখানায় ভিমরি খেল, মাত্র ঘণ্টা আটেক আগে দুলীর জীবনে ছন্দপতন ঘটে গেছে বিরাট রকমের। পল্লীর বাড়িতে ভীষণ

ব্যস্ততা, কাচাকুচির মধ্যে বৌদির অনুপস্থিতিতে সুরেন মুখুজ্জে ওরফে বাবু এসে জানালার ফাঁক দিয়ে দেখেন তাকে আর ধোঁয়া ছাড়েন। খুকখুক কেশে দুলী ঘাড় ঘোরায়।

অহেতুক সময় নষ্ট হয়ে যায় দেখে সুরেনবাবু কাছে এসে বলেন - কেলোর মা, কাপড়টা তো ছিঁড়ে গেছে।

সায়া ছিল না। লজ্জা পেয়ে দুলী প্রথম কথা বলল, কি করেন বাবু।

সুরেনবাবু আগ্রহ সহকারে চেয়ে বলেন, ঠিক আছে কাপড় যখন দিতেই হবে, কালটাল নিয়ে আসব একটা। কথাগুলো ভাসা-ভাসা অথচ দৃঢ়। যেন ইচ্ছে করলে সব অর্থনৈতিক ভারই নিতে পারেন।

দুলী কিছু বলল না। অতসত বোঝার বুদ্ধি নেই তার। এইসব বর্ণনা বাদ দিলেও সুরেনবাবু তার কাজটা করে বসলেন। হ্যাচকা টানে হাত ছাড়িয়ে নেবার সময় থাবায় কানায় থেথলে গেল কনুইটা। প্রথমে সাদা হাড় তারপর রক্ত। দুলী তালু দিয়ে ক্ষতস্থানটা চেপে ধরে। অন্য কেউ হলে বটি দিয়ে এর স্বাগতম জানাতো সে। কিন্তু বাবুর আকুতি মিশ্রিত মুখখানা দেখে কেমনপানা হয়ে যায় সে।

যাকে যত বিশ্বাস করা যায়, এ দুনিয়ায় সেই অলক্ষ্যে কাঁটা ছড়াতে ব্যস্ত। এই ধারনা নিয়ে দুলী অন্ধকার যাপন করছিল। আর ভাবছিল— লালসা কখনও বাপটি দিয়ে থাকে না, তখন আসে না জাত বিচার।

এই ভাবে অনেকক্ষণ জিরিয়েটিরিয়ে শুকো ছোঁবড়া খুঁজতে রান্নাঘরে ঢুকল। আবছা মূর্তি দেখে তার লোমগুলো খাড়া হয়ে ওঠে। গা—টা ছমছম। এক পা না পিছিয়ে দেশলাই জ্বালল।

তবে ইদানীং এ ঘরে বৌ মাঝে মাঝে চুপচাপ বসে থাকে। অথবা আঁচল বিছিয়ে বিশ্রাম করে। এই তো সেদিনও কাপড় জড়িয়ে খুথনীটা ঠেসান দিয়ে বসেছিস দুলী। নিভন্ত কাঠি ফেলে বলে, কী করিস এই আন্ধারে? কার মতলবে বসে আছিস?

এক ঝোঁকের বশে দুলী বলে - নাঙের জন্তে।

কয়েক মুহূর্ত কাটার আগেই শুকো ধাপধুপ কতকগুলো লাথি জমিয়ে দিয়েছিল। পিছন ফিরে শুধু শুনতে পেয়েছিল দুলী হাউমাউ না করে এমন শব্দে গজরাচ্ছে।

এবার আন্দাজটা পরিষ্কার হয়ে ওঠে শুকোর কাছে তাড়াতাড়ি ঢোক গিলে ফেলে। উল্টে ফিরে একলাকে খরে চুকে চাপা, গম্ভীর স্বরে প্রথম পক্ষের মদনকে ডাক দেয়—মদন, এই মদন ওঠদি।

এই মুহূর্তে তার লাফিয়ে বলা উচিত। পায়ের ধারে শুয়ে তার ঠাকুমা। কানা বুড়ি। সে হাঁচা করতে করতে জিজ্ঞেস করে—অ শুকো, ডাকলি ক্যান? কী হইচে?

শুকো মদনের মুড়ো ধরে ঝাঁকারী দেয়—এই বেগে বেরো।

মদনের মা একগাদা ছেলেপুলের মাঝে ঘুমোচ্ছিল। কাঁধের ওপর আঁচল ফেলে কোনরকমে কাপড় গুঁজতে গুঁজতে নিচুপ ঘুমের ঘোর কাটাতে কাটতে এগোয়, ফুলীকে একদিন বেশ্যামাগী বলেছিল। পরিনামে চুল ছেঁড়াছেড়ি হয়েছিল এক চোট। সেই থেকে দুই সতীনের মধ্যে প্রচণ্ড হিংসা। রেষারেষি। সে এখন এই ব্যাপারে নির্লিপ্তের ন্যায় পাছা চুলকোচ্ছে।

শুকো এবার ধীরে ধীরে সূত্র ধরে এগোবার চেষ্টা করে। রাত ভারী করে বাড়ি ফেরা, হুটহাট কোথায় চলে যাওয়া এসবে তার মনে চিড় ধরেই প্রায় অসহ্য হয়েই বলেছিল—নিত্যি নিত্তি ছেনালী করবি তো এ বাড়ি থেকে নামে কর।

কথাটা শুনে নিজের মনে আস্থা রাখতে পারল না আর। মনটা অসম্ভব চুপসে গেল। আপনজনের কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হলে কেউ ঠাঁই দেয় না। তাই ভাবল। মাঠের মধ্যিখানে গিয়ে ছেলেকে চুপচাপ কোলে বসিয়ে, চুপচাপ খেতে খেতে ভাবল এবং এও চিন্তা করল কেলো নেয়না, পুচকেও এলোমেলোর মধ্যে যা হোক একটা ব্যবস্থা হবেই। ফুলী তাই মুখর অপবাদকে মুছতে চায়।

হাতে-পায়ে টান ধরিছে। মুখ দিয়ে গ্যাঁজা, বুড়ি বুকের কাগড় তুলে ডলে দিচ্ছে। আর কাঁদছে বিলাপের সুরে—বউ এ তুই কি করলি?

বাবা ছোট মাকে বাইরে নে যাবো? ইয়া চেহারার মদন বলল।

শুকো আত্মসমর্পনের ভঙ্গিতে সবকিছু লাগাম ছেড়ে হয়ত দুটো হাঁটুর ওপর ল্যাল ল্যাল ছড়িয়ে মাটিতে বসে পড়ল। এই অবস্থায় ঘটনাটা বোবা নিরীক্ষণ ছাড়া আর কিছুই মনে আসছে না।

ইতিমধ্যে দু' একটা পড়শি জড়ো হতে শুরু করেছে, রাত্রি গভীর না হলে এর দর্শক যে দ্বিগুন তিনগুন আরও বেশী ছড়িয়ে পড়ত তাতে সন্দেহ নেই।

দুলী তো ইচ্ছে করেই মৃত্যু ডেকে এনেছে। মরার আগে মানুষকে মিষ্টিমিষ্টি খাওয়ায়। কিন্তু বুড়ি তেঁতুল গোলা, গোবর গোলা ইত্যাদি ছাগলের মাড়ি ফাঁক করে গোলানো বিচালীর মতো খাইয়ে দিচ্ছে। মাঝে মাঝে বমির সঙ্গে তেলেভাজা, টুকরো রুটি বেরুচ্ছে। আর বেরিয়ে আসছে তেলতেলে জ'ল। 'কি গ্যাস রে বাবা'—কেউ কেউ বলল! ভিড়ের মধ্যে আবার মুখ দিয়ে বেরোল—বুনো জাত আর কত হবে?

সব রাগ, অপমান সহ্য করে নির্বিকার শুকো নিজে নিজেই শাস্তি পাবার চেষ্টা করে। সংক্ষিপ্ত আউট লাইনে বলে, আমি কি খেতে বলেচি। মরুগগে।

কথার মধ্যে যতটা না শব্দ হলো, শুরু হলো তার চেয়ে বেশী গুঞ্জন। সেই কলরব ভেদ করে একটা ছেলে বলল, চল হাসপাতালে—

রিক্সায় উঠতে এমনিতেই দুলীর কষ্ট হয়। তার উপর সারা দেহটা কালা গাছের মতন সটান শক্ত। চোখের কোল বেয়ে উজ্জল অশ্রুর দাগ। মনে হচ্ছে নজরটা এই ঘৃণিত মানুষজন পৃথিবী, খিদে, স্নেহ আর ওই বালা বদল করা গতরখেগো সোয়ামীর দিকেই ঠাই নিবদ্ধ।

"সত্যাগ্রহে দহিয়া দহিয়া হয়েছে যে খাঁটি সোনা,
দেশের সেবার সাথে চলে যার সত্যের আরাধনা......"

—সত্যেন্দ্রনাথ।

দাঁতের রোগ ও তার প্রতিকার

—ডাঃ হরিপদ আইচ

অবৈতনিক সম্পাদক

ইণ্ডিয়ান ডেণ্টাল এ্যাসোশিয়েসন

পঃ বঃ শাখা

আমাদের দেশের জনসাধারনের ভিতর অনেকের একটি প্রচলিত ধারনা আছে যে দাঁতে পোকা লাগে এবং দাঁতে যন্ত্রনা হলে দাঁত তুলে ফেলতে হয়। অথচ এটা বৈজ্ঞানিক সত্য যে দাঁতে পোকা লাগে না বা সাধারণ অর্থে দাঁতে পোকা বলে কিছু নেই। তবে দাঁতে যে গর্ত্ত বা ক্যাভিটি হয় তার কারণ—

দাঁত নিয়মিত ও সঠিক নিয়মে ব্রাশ না করলে, দাঁতে এক রকম আঠার মত পদার্থ জমে যাকে বলা হয় ডেণ্টাল প্লেক। ঐ ডেণ্টাল প্লেক মুখের ভিতর জীবাণু সৃষ্টির সহায়তা করে থাকে। জীবাণুগুলি শর্করা জাতীয় খাদ্যের সহায়তায় মুখের লালা বা স্যালাইভাতে অম্লের সৃষ্টি করে।

অ্যাসিডিক স্যালাইভা-বা অম্ল লালা দাঁতের উপরের মসৃন কঠিন আচ্ছাদন এ্যানামেলকে ক্ষয় করে এবং দাঁতে পরবর্ত্তী আচ্ছাদন ডেণ্টিনে প্রথমে ক্ষুদ্র একটি ক্ষয় বা গর্তের সৃষ্টি করে। পরবতী পর্য্যায়ে সেই গর্তে খাদ্য কণিকা প্রবেশ করে এবং দুষিত খাদ্য কণিকাগুলি জীবাণু সৃষ্টি করেতে সাহায্য করে। জীবাণুগুলির ভিতর ল্যাকটো ব্যাসিলাস অ্যাসিডো ফিলাস নামে এক প্রকার জীবাণু সব চেয়ে বেশী সক্রিয় বলে বেশীর ভাগ বৈজ্ঞানিক-গণ মনে করেন। পৃথিবীর সর্বত্রই এই রোগের আক্রমণ দেখা যায়, একমাত্র আফ্রিকার অধিবাসী ও এস্কিমোগণ ছাড়া। কারণ ঐ অধিবাসীরা আধুনিক খাদ্য অভ্যাসে অভ্যস্ত নয়। আধুনিক খাদ্য অভ্যাসের জন্যই এই রোগ বিশেষ স্থান করে নিয়েছে। অবশ্য আরও অনেকগুলি বৈজ্ঞানিক কারণ আছে তবে সেগুলির বিস্তারিত আলোচনা সংক্ষিপ্ত রূপে সম্ভব নয়।

পরবর্ত্তী পর্য্যায়ে দাঁতের ভিতরে পাল্প পর্য্যন্ত যখন জীবাণুগুলি প্রবেশ করে তখন দাঁতের যন্ত্রনা হয় ও কোন কোন সময় যন্ত্রনা অসহ্য হয়। সেই অবস্থায় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দাঁত তুলে ফেলতে হয়।

দাঁত বা মাড়ীর রোগ থেকে বিভিন্ন রোগ হতে পারে যেমন হাত পায়ের গাঁটে গাঁটে ব্যথা। মাথা যন্ত্রনা, চোখের ব্যথা, বহুবিধ পেটের রোগ তা ছাড়া হার্ট, মাংসপেশী ও জয়েন্টের বিভিন্ন রোগ দাঁতের ইনফেক্শন থেকে হতে পারে। এমনকি একপ্রকার জ্বর যাকে বলা হয় ষ্টেপাটো ককাল্ ফিভার তা দাঁতের ফোকাল ইনফেকশন থেকে হতে পারে। এ ছাড়া মানুষের শরীরে বহুবিধ ব্যাধি যে কোন ইনফেক্শন থেকে হতে পারে। সুতরাং দুষিত দাঁত ও অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

সুস্থ দাঁত শুধু কথা বলা, খাদ্য দ্রব্য চর্বণ করা ও মুখের সৌন্দর্য্য রক্ষা করার জন্যই নয়। সুস্থ ও স্বাভাবিক স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যও প্রয়োজন।

মাতার ছয় সপ্তাহ গর্ভাবস্থায় ভ্রূনের প্রথম নিচের চোয়ালের হাড় ও দাঁত গঠণের প্রথম অবস্থা স্বাভাবিক ক্রমবিকাশের পদ্ধতির মধ্য দিয়ে বিকশিত হতে থাকে এবং সন্তান জন্ম লাভের ৬ থেকে ৮ মাস বয়সে প্রথম দন্ত উদ্‌গীরণ শুরু হয়।

সুতরাং গর্ভবতী মাতারগর্ভাবস্থা থেকেই সুষম খাদ্য প্রচুর পরিমাণে খাওয়া উচিত। শিশুদের দন্ত উদ্‌গীরনের বয়স থেকেই ভিটামিন এ, ডি সি জাতীয় খাদ্যগুলি প্রয়োজন মত খাওয়ানো উচিত।

পরিশেষে দাঁতের কতকগুলি সাধারণ রোগ ও তার প্রতিকারের বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে।

ডেণ্টাল ক্যারিস থেকে দাঁতের যন্ত্রনা হয়। মাড়ী থেকে পুঁজ, রক্ত পড়ে ও মুখে দুর্গন্ধ হয়। দাঁতের গোড়ায় পাথর জমে জমে মাড়ী ও হাড়কে দুর্বল করে ও দাঁত নড়ে গিয়ে অসময়ে পড়ে যায়। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের উচু, নীচু বা এলোমেলো দাঁত ওঠে। ভিটামিনের অভাবে মুখের ভিতর ঘা, জিভে ঘা বা দাঁতের পার্শ্বে ধার জনিত জিভে ঘা হয়। আমাদের দেশের কোন কোন স্থানে বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষা করে দেখেছেন যে মোট ক্যান্সারের ৪০% হল মুখ সম্বন্ধীয় ক্যান্সার এবং এর কারণ মুখসম্বন্ধীয় রোগের দীর্ঘ দিনের অবহেলা।

উল্লিখিত রোগগুলিই আমাদের দেশে বেশী দেখা যায়। প্রতিকারের বিষয়গুলি সম্পর্কে সকলেরই অবগত থাকা প্রয়োজন। যেমন—

প্রত্যহ নিয়মিত আহারের পরে দাঁত ব্রাশ করা এবং ছোটদেরও তিন বৎসর বয়স থেকে অভ্যাস করানো উচিত। অতিরিক্ত পান, বিড়ি, সিগারেট তামাক না খাওয়া। মাড়ীর বা দাঁতের গোলযোগ দেখা দিলে উপযুক্ত সময়ে দন্ত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের দাঁতের গঠন উচু বা এলোমেলো থাকলে সময় মত চিকিৎসা করে ঠিক করে নেওয়া যেতে পারে। বেশী বয়সে অনেক ক্ষেত্রেই চিকিৎসার সুফল পাওয়া যায় না। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের অতিরিক্ত মিষ্টি খেতে বারন করা ভালো। লজেন্স, টফি ও বিভিন্ন মিষ্টি কম খাওয়া উচিত এবং খাওয়ার পর মুখ ভাল করে ধুয়ে ফেলা দরকার। দাঁতের কোন রোগ নিয়ে হাতুড়ে চিকিৎসকের কাছে না যাওয়াই উচিত, তাতে উপযুক্ত চিকিৎসার হাত থেকে বঞ্চিত হতে হয়।

ইণ্ডিয়ান ডেন্টাল এ্যাসেসিয়েশন, পঃ বঃ শাখার উদ্যোগে, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গ্রামে বিনা ব্যয়ে দন্ত চিকিৎসার শিবির খুলে জনসাধারনের দাঁতের রোগ প্রতিকারের ব্যবস্থা দীর্ঘ কয়েক বৎসর ধরে করে আসছে এবং সে সুযোগ আজকাল অনেকেই গ্রহণ করছেন। সব শেষে বলা যেতে পারে "ভাল দাঁত মানেই"—ভাল স্বাস্থ্য।

[শিক্ষা সমাজের মধ্যে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ঘটানোর একটি অন্যতম উপায়। শিক্ষা দিয়ে আমরা জীবনের সামান্যতম ও মনের মধ্যে বহু যুগের জমাট বাঁধা অন্ধ বিশ্বাসকে দূর করে পারি। —ডঃ রাধা কৃষ্ণণ]

মানুষ বনাম বন্যা

মুকুল দাস

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে ও আসামে প্রায় প্রতি বৎসরই বন্যা দেখা দেয়। প্রত্যেকবারের বন্যাতেই প্রচুর প্রাণহানি ঘটে—। বন্যায় একদিকে যেমন প্রাণহানি হয় তেমনি প্রচুর টাকার সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতিও ঘটে।

গত বৎসর পশ্চিমবঙ্গে যে ভয়াবহ বন্যা দেখা দিয়েছিল তাতে এই প্রদেশের অর্থনীতিতে এক বিরাট আঘাত হানে। বন্যা পীড়িত অঞ্চলের মানুষের জীবনের মূলই ছিড়ে গিয়েছিল। হাওড়া-হুগলী মেদিনীপুর মালদা মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলার বন্যা কবলিত অঞ্চলের ক্ষতির পরিমাণ এখনও সম্পূর্ণ ভাবে হিসাব করা যায় নি। একথা বলা যায় ঐ বন্যা পশ্চিমবঙ্গের জনজীবনের উপর এক বিরাট ছাপ ফেলে গেছে। ত্রাণ কার্যের জন্য সরকারি খাতে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে, বন্যা পীড়িত লোকজনের দুঃখ দুর্দশা লাঘব করার জন্য। বেসরকারি খাতেও বহু টাকা খরচ করা হয়েছে যার হিসাব কেউ রাখে না। এই ঘটনা পশ্চিমবঙ্গের বুকে প্রথম নয়। কারণ কখনও মেদিনীপুর, কখনও মুর্শিদাবাদ বা কখনও উত্তরবঙ্গে এই ধরণের বিপর্যয় নেমে আসছে। আর যখনই বিপর্যয় নেমে আসে তখনই তৎকালীন সরকার উদ্ধারকার্যে নেমে পড়েছে এবং বন্যা রোধের ব্যবস্থার ও প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে কিন্তু এখনও পর্যন্ত বন্যা নিবারণের স্থায়ী সমাধান কিছু হয়নি। বন্যা নিয়ন্ত্রনের নামে যে সব পরিকল্পনা আমাদের দেশে নেওয়া হয়েছে তাতে করে দেশের সাধারণ চাষী ও জনগনের কোন স্বার্থ রক্ষা হয়নি।

ঐ সব পরিকল্পনাগুলি বিচার করলে দেখা যায় যে, নিম্নলিখিত অত্যাবশ্যক বিষয়গুলি সুপরিকল্পিতভাবে অবহেলিত হয়েছে :—(১) সস্তায় জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন এবং ভারতে নতুন নতুন শিল্প বিকাশ ঘটান (২) ভাগীরথী, হুগলী নদীরমাঝে কলকাতা বন্দর তথা পূর্ব ভারতের শিল্প বাণিজ্য বিনষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করা। (৩) কিছু বাঁধের সাহায্যে ও সেচের ব্যবস্থা করে

পরিকল্পনার রূপ দেওয়া। (৩) মজা নদী সংস্কার ও পুনরুজ্জীবনের সুষ্ঠ ব্যবস্থা না করে শুধু রাস্তাঘাট ও ট্রান্সপোর্টের বিস্তার করা।

পশ্চিমবঙ্গের বন্যা নিয়ন্ত্রনের জন্য সবচেয়ে বড় পরিকল্পনা হল দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল ১৯৪৩ সালের দামোদরের বন্যার পর এবং স্বয়ং ইংরেজ সরকারই নিয়েছিল তার নিজের স্বার্থে। এই পরিকল্পনার কাজ শুরু হয় ১৯৫১ সালে এবং পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্ভূক্ত হয়। পরিকল্পনা যা সুপারিশ করা হয়েছিল পরবর্তিকালে তাও সম্পুর্ণ কার্যকর হয়নি। এই পরিকল্পনা সম্পর্কে বিখ্যাত ইঞ্জিনীয়ার শ্রীকপিল ভট্টাচার্যের মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে—"তাড়াহুড়ো করে পর্যাপ্ত তথ্যের অভাবের এই পরিকল্পনা কার্যকরী করবার চেষ্টা হওয়াতে কতকগুলি মারাত্মক ত্রুটি থেকেই যাচ্ছে।......কারণ যে বিদেশী স্বার্থ প্রথম থেকেই পরিকল্পনায় মাথা ঢোকবার সুযোগ পেয়েছে, সে স্বার্থ যে আমাদের দেশে মুলত জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা বানচাল করে দেবে, সেটা আমরা প্রথম থেকেই জানি।" "নদীর খাত মজে যাওয়ার ফলে নিম্নাঞ্চলে বন্যা বন্ধ হবে না।...সুষ্ঠু জল নিকাশী পরিকল্পনার অভাবে আরামবাগ মহকুমা, হাওড়া ও মেদিনীপুর জেলায় প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে।'..."দামোদর বন্যা নিরুদ্ধ হলে কলিকাতা বন্দরের নাব্যতা ধ্বংশ হবে, অতি অল্প সময়ে।.... আশু ব্যবস্থা না হলে ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কলিকাতা বন্দরের ধ্বংস অনিবার্য।" শ্রীভট্টাচার্য্য বৈজ্ঞানিক দিক থেকে যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছিলেন যে ফারাক্কা নির্মিত হলে মুর্শিদাবাদ জেলায় বন্যা হবে এবং হুগলী নদীর ক্ষতি হবে। যার জন্যে শ্রীভট্টাচার্য্যকে গ্রেপ্তার করার হুমকি দেওয়া হয়েছিল বলে জানা যায়।

পশ্চিমবাংলার চেয়েও ঘন লোকবসতি এবং আলপস্ পর্বত থাকা সত্ত্বেও ফ্রান্সে বন্যা হয় না। কারণ সেখানকার চল্লিশ হাজার মাইলের মত জলপথ নিয়মিত রক্ষনাবেক্ষণ করা হয় সুপরিকল্পিত ভাবে। হল্যাণ্ডের প্রায় ৬০% জমি বাঁধ দিয়ে জল সরিয়ে সমুদ্র থেকে উদ্ধার করে চাষের কাজে লাগান হয়েছে। ইটালির নদীগুলি তাদের সমাজের কল্যানে এখনও শাসিত হয়। আমাদের সামনে সবচেয়ে দৃষ্টান্ত আজ চীনের নদী পরিকল্পনা। দামোদরের ন্যায় চীনের হোয়াংহো নদী চীনের দুঃখের নদী বলে পরিচিত ছিল। তাছাড়া ইয়াংশিকিয়াং ও চীনে কম ধ্বংসলীলা চালায়নি।

কিন্তু ১৯৪৯ সালের পর সুন্দর নদীপরিকল্পনার সাহায্যে একদিকে যেমন বন্যার হাত থেকে চীন রক্ষা পেয়েছে অন্যদিকে এর দ্বারা বিরাট জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মিত হয়ে বিদ্যুৎসমস্যার সমাধান করেছে।

তাহলে প্রশ্ন জাগে আমাদের দেশে হচ্ছে না কেন? আমাদের দেশে কি প্রযুক্তি বিদ্যা বা পরিকল্পনা রচনাকারির অভাব আছে? নাকি সমস্যা সমাধানের ইচ্ছাই নেই? কিন্তু নদী বিশেষজ্ঞের মতে এইসবের অভাব আমাদের দেশে নেই। পশ্চিমবঙ্গের বন্যা সমস্যার সংগে আর একটা সমস্যাও একসূত্রে গাঁথা যায়। সেটা হল বিদ্যুৎসংকট। আজ বিদ্যুতের অভাবে খেতে খামারে, কলে কারখানায় ও জনজীবনে এক অবর্ণনীয় দুরবস্থা দেখা দিয়েছে। এ অবস্থার আশু সমাধানের কোনো সম্ভাবনা নেই। পশ্চিমবঙ্গের বর্ত্তমান চাহিদা প্রায় ১২৪০ MW (মেগোওয়াট) এবং প্রতি বৎসর চাহিদা বৃদ্ধি পায় ১০%। অথচ উৎপন্নের মোট ক্ষমতা ১০৪০ MW (যদিও কখনই ক্ষমতা অনুযায়ী উৎপন্ন হয় না)। আমাদের দেশের বিদ্যুৎ বেশীর ভাগই উৎপন্ন হয় তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পে। যাতে বিদ্যুৎ উৎপন্নের খরচ বেশী পড়ে। অথচ পশ্চিমবঙ্গে জলবিদ্যুতের সম্ভাবনা বেশী থাকা সত্ত্বেও সেদিকে নজর দেওয়া হয়নি। জলবিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণে প্রাথমিক খরচ বেশী হলেও তাতে করে বিদ্যুৎ উৎপন্নের খরচ কম হয় এবং সুষ্ঠু পরিকল্পনা থাকলেও সেচেরও সুবিধা হয় এবং বন্যা রোধ করা যায়। কিন্তু ইংরেজ আমল থেকেই জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি এবং পরেও এর উপর জোর দেওয়া হয়নি। কারণ বিচার করলে দেখা যায় তাপবিদুৎ কেন্দ্রগুলি বসিয়েছে ইংলণ্ড, আমেরিকা, রাশিয়া ও অন্যান্য বিদেশী প্রভুরা প্রচুর লাভের আশায়।

জলবিদ্যুৎ পরিকল্পনা হিসাবে একমাত্র ডিভিসিই নির্মিত হয়েছিল। কিন্তু সেটাও দেখা যায় ইংরেজ সরকার বাধ্য হয়েই নিজের স্বার্থে করেছিল। ১৯৪৩ সালে দামোদরের ভয়াবহ বন্যায় জি টি রোড বিধ্বস্ত হয়ে যাওয়ায় যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে সৈন্যবাহিনী চলাচল সঠিক রাখতে এই পরিকল্পনা গ্রহন করে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে ডিভিসির পরিকল্পনাকারীর অন্যতম বৈজ্ঞানিক ডঃ মেঘনাদ সাহার পরিকল্পনাও যথাযথ রূপ দেওয়া হয়নি।

তাছাড়া হুগলীর বিভিন্ন জায়গায় ব্রীজ তৈরী হওয়াতে এই নদীর জল বহণ ক্ষমতা দিন দিন কমে যাচ্ছে ও চরা পড়ে যাচ্ছে। হুগলী নদীর মোহনায় তাই আস্তে আস্তে পলি পড়ে ব-দ্বীপ সৃষ্টি হওয়ায় মোহনামুখী জলের গতিকে মন্থর করে দিচ্ছে। যেহেতু দামোদর, রূপনারায়ণ নদী হুগলী নদীতে মিশেছে তাই রূপনারায়ণ ও দামোদরের উপর দিয়ে জল বহণ ক্ষমতাও কমে গেছে। নদীর মোহনা পরিষ্কার না থাকলে জল বহণ ক্ষমতা কমে যায় ও পলি পড়ে। আমাদের দেশের নদীর গভীরতা রক্ষা করতে কোন সুপরিকল্পনাই নেওয়া হয় না।

উপরের স্বল্প আলোচনায় আমরা দেখতে পাই সে বন্যায় যে লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারায় নিঃস্বম্বল হয়ে পড়ে তার জন্য শুধুই প্রকৃতিকেই দোষারূপ করলে চলবে না। তার জন্য আমরা মানুষেরাই দায়ী। বন্যার সময় সরকার সহ বিভিন্ন চ্যোরিটেব্‌ল্‌ প্রতিষ্ঠান, ত্রাণ কার্যে এগিয়ে আসেন। এটা নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে। কিন্তু তার চেয়েও বেশী প্রয়োজন এই বন্যাকে কি ভাবে বন্ধ করা যায় তার জন্য সোচ্চার হওয়া।

ফুটবল ষ্টেডিয়াম কি স্বপ্ন হয়েই থাকবে ?

অচিন রায়

(ক্রীড়া সাংবাদিক—পি টি আই)

সাতাত্তরে ফুটবলের রাজা পেলের কলকাতায় আসার কথা রটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চারিদিকে টিকিটের জন্যে সোরগোল পড়ে যায়। তবু ভাল, মাঠ নিয়ে এবার খেলাটা জমতে পরে নি, ইডেনের মাঠেই খেলাটা হল। অবশ্য সে মাঠ মৌসুমী বায়ুর প্রকোপে খেলার উপযুক্ত থাক আর নাই থাক। অন্ততঃ পক্ষে প্রচুর টাকার আদ্যশ্রাদ্ধ করে পেলেকে নিয়ে রসিকতা করা হয়েছিল।

অবশ্য ফুটবল নিয়ে স্থান, কাল, ও পাত্রের এই সমস্যা আমাদের অভিজ্ঞতায় নতুন নয়। বড় খেলা দেখার টিকিট নিয়ে প্রথমে হৈ চৈ, পরে ক্ষোভ, বিক্ষোভ এবং শেষে পতন, মূর্চ্ছা ও মৃত্যু পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে বছর বছর ফিরে আসে! কলমনবীশদের লেখার ধাক্কায় টন টন কাগজ উড়ে যায়, সমস্যার নানাদিক আলোচনা, সমালোচনা ও বিবেচনা করার অনুরোধে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ নির্বিকার, তাঁরা কানে দিয়েছেন তুলো আর পিঠে বেঁধেছেন কুলো। তাই সমস্যার মূলে যে স্টেডিয়ামের অভাব—সে ব্যাপারে একটু মৌখিক স্বীকৃতি জানিয়েই তাঁরা একচক্ষু হরিণের মত ঘোর বর্ষায় ইডেনের 'কালিদহেই' খেলাটার ব্যবস্থা করে হাত ধুয়ে বসে থাকেন। তারপর বক্তৃতাবাজী ছাড়া আর যেন কিছুই তাঁদের করণীয় থাকে না।

ফুটবল মরশুম শুরু হওয়ার মুখে চারিদিকে বিশেষণের বাহারী বহর দেখে প্রাণ হরষিত হয়ে ওঠে। কলকাতা নাকি হোম অফ্ ফুটবল; বাঙ্গালীরা ফুটবলের নামে পাগল। দুর্গাপূজোর আগে ঢাকে কাঠি আর বসন্তের শেষে ফুটবলে লাথি নাকি বাঙ্গালীকে তাতানো ও মাতানোর পক্ষে যথেষ্ট। শতবর্ষ আগে বাঙ্গালী নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী এই কলকাতার মাঠেই নাকি প্রথম বলে কিক করে ভারতীয় ফুটবলের সূচনা করেছিলেন। কিন্তু হায় এতসব গালভরা তত্ত্বের পর যদি প্রশ্ন করা যায় যে ফুটবলের পীঠস্থান

এই বাংলাদেশে খেলার জন্যে একটাও ভাল স্টেডিয়াম নেই কেন, তাহলেই বিজ্ঞ অজ্ঞ নির্বিশেষে সকলেই দ্বিজেন্দ্র লালের নন্দলালে প'রিণত হন।

সেদিন কথাপ্রসঙ্গে আমাদের ঐতিহ্যমণ্ডিত আই এফ এ'র সম্পাদক শ্রীঅশোক ঘোষকে জিজ্ঞেস করেছিলাম,—হ্যাঁ মশাই, দেশের প্রচীনতম আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতায় এই দুর্দশা কেন? উনি বললেন, শীল্ড খেলার সময়টা বড়ই বেগতিক তাই বাইরের ভাল দল আসতে চায় না। আমি বললাম, সেকি! মালয়েশিয়াতে শুনছি ধারা বর্ষণের খুবই প্রাবল্য, কিন্তু সেখানে মারদেকার মত আন্তর্জাতিক ফুটবলের আসর বসে কি করে। এবার উনি একটু ঝেড়ে কাশলেন। বললেন, আমাদের এখানে বৃষ্টির জন্যে যত না, তার চেয়ে বেশী অসুবিধে হয় মাঠ নিয়ে। ভাগ্যের পরিহাসে আমাদের এই সিটি অফ্ ফুটবলে কেবলমাত্র ফুটবলের জন্যে একটাও নাকি মাঠ নেই। ফলে মাঠের মধ্যখানে যেখানটায় ক্রিকেটের পীচ হয়, বৃষ্টি হলেই সেখানকার মাটি গলে একেবারে ঘাঁট। সেখানে আর যাই হোক ভাল ফুটবল খেলা যায় না। আর ইডেনে ফুটবলের কথা না তোলাই ভাল। আমি তখন বললাম, প্রতিকারকল্পে একটা ভাল ফুটবলের মাঠ ও তার সঙ্গে উপযুক্ত একটা স্টেডিয়াম গড়ে তোলার জন্যে আপনাদের কি কোন দায়িত্ব নেই? এই ফুটবল শতবর্ষের পর একমাত্র নগেন্দ্রপ্রসাদের একটি পুতুল প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই কি আই এফ এর সব দায়িত্বের অবসান হয়ে যায়। সম্পাদক মশাই অতঃপর একটু উষ্ণ হয়েই জবাব দিলেন,—আমরা কি করব? মাঠ থেকে যা আয় হয়, যায় সরকারের ঘরে; আমরা বছরে গোণাগুণতি যে কটি প্রদর্শনী খেলার ভার পাই তার আয় থেকে আমাদের সমিতির খরচখরচা বাদে যা থাকে তা ক্লাবগুলোকে কিছু কিছু অনুদান দিতেই ফুরিয়ে যায়। আমাদের হাত পা বাঁধা; এর বাইরে পা বাড়াবার উপায় নেই।

সরকারী বক্তব্য শোনার জন্যে মহাকরণ অভিযানে আর পা বাড়াই নি। তবে খেলাধূলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একজন সরকারী সচিবকে মাঠে পেয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম,—মাঠ থেকে এই যে বছর বছর গ্যালারীভর্তি টাকা আদায় হয় সেটা যায় কোথায়। তিনি প্রায় আকাশ থেকে পড়লেন; বললেন, সরকার আর টাকা পায় কোথায়; মোটা টাকা তো আই এফ এ প্রদর্শনী খেলা থেকেই তোলে। সরকারের তরফে যা আদায় হয় তা মাঠের ঠাট

বজায় রাখতেই চলে যায়। একদিন অফিসে আসুন না, আয় ব্যয় সব জলের মত বুঝিয়ে দোব।' অফিসে আর যাওয়া হয় নি কিন্তু বুঝতে ভুল হয়নি যে লাভের গুড় কোন পিঁপড়েয় খাচ্ছে তার সূত্র বার করা শিবের বাবারও অসাধ্য। ফলে অবস্থা সেই যে যেখানে দাঁড়িয়ে। ফুটবলের মাতব্বরী করে ব্যক্তিবিশেষের প্রাসাদোপম অট্টালিকা ওঠে কিন্তু মাঠ ও স্টেডিয়ামের ব্যাপারটা শূন্যে সৌধ নির্মাণের মতই আশমানে ঝুলে থাকে। অবশ্য স্টেডিয়াম না হোক, নাকের বদলে নরুনের মত গোষ্ঠ পালের মূর্তি বসানোর জন্য সরকারী কমিটি একটা হয়েছে। শতবর্ষে এটাই বোধ হয় আমাদের ফুটবল প্রেমের চরম পরাকাষ্ঠা হয়ে থাকবে।

অথচ সদিচ্ছার অভাব না থাকলে এবং প্রচেষ্টা আন্তরিক হলে এই কলকাতার ময়দানেই যে ভেলকি দেখানো যায় তার জাজ্জ্বল্য প্রমাণ আমাদের হাতের কাছেই রয়েছে। নিষ্ঠার যথার্থতায় কত অল্প সময়ে একটি দুরূহ কাজ কত সুচারুরূপে সম্পন্ন করা যায়, প্রমাণ নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়াম। ফুটবল স্টেডিয়ামের প্রয়োজন ও দাবী বহুদিন আগে সোচ্চার হলেও, অবস্থা যে তিমিরে সেই তিমিরে। স্বাধীনতা উত্তর যুগে অনেক টালবাহানার পর আশা জেগেছিল যখন তদানীন্তন কংগ্রেস নেতা শ্রীঅতুল্য ঘোষ আই এফ এর সভাপতি হয়েছিলেন। শোনা গিয়েছিল তিনি নাকি এ্যালেনবরা কোর্সে একটি ফুটবল স্টেডিয়াম নির্মাণের জন্যে প্রতিরক্ষা দপ্তরের সম্মতি আদায় করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তী রাজনৈতিক ডামাডোলে সে সাধু প্রস্তাব ঘোল খেয়ে যায়। পরে আবার আশার সঞ্চার হয়েছিল শ্রীসিদ্ধার্থ রায় মুখ্যমন্ত্রী হবার পর। তারপর থেকে তার কাছে অনেক মধুঝরা আশ্বাস শোনা গেছে—রবীন্দ্র সরোবরে সুইমিং কমপ্লেক্স থেকে ময়দানে ফুটবল স্টেডিয়াম পর্যন্ত কিন্তু সবগুলোই সুকুমার রায়ের ভৌতিক আদরের মতই কোথায় বা কী ভূতের ফাঁকি মিলিয়ে গেল ফট্ করে। এমন কি অবশেষে অনেক ঢাক ঢোল পিটিয়ে পাণ্ডা পুরুত ডেকে বিধাননগরে যে স্টেডিয়ামের শিলান্যাস করা হয়েছিল সে সম্বন্ধেও আর কোন উচ্চবাচ্য শোনা যাচ্ছে না।

পেলে আসবে অথবা বেকেনবাওয়ার আসবে—একথা মন্ত্রী পর্যায়ে ঘোষণার আগে উচিত ছিল ভেবে দেখা তাদের খেলার যোগ্য মাঠ আমরা দিতে পারব কিনা; অথবা তাদের খেলা দেখার জন্যে জনমানসে যে প্রচণ্ড চাহিদার সৃষ্টি

হবে তা পূরণ করার ক্ষমতা আমাদের আছে কি না। অন্যথায় এ সমস্তই ঘোড়ার আগে গাড়ীর জোতার মতই হাস্যকর।

আন্তর্জাতিক আসরে ভারতীয় ফুটবলের শোচনীয় ব্যর্থতায় হা হুতাশের মহরম করে কি লাভ যদি আমরা ন্যূনতম প্রয়োজন কেবলমাত্র ফুটবলের জন্যে একটি মাঠের ব্যবস্থা না করতে পারি। যেখানে ফুটবলের নামে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ টাকার বেনামী লেনদেন হয়, যেখানে বহিরাগত একটা দ্বিতীয় শ্রেণীর দলের খেলা থেকেই লক্ষ লক্ষ টাকার মুনাফা আদায় হয়; যেখানে প্রিয় দলের খেলা দেখার জন্য আপামর জনসাধারণ হাজারে হাজারে অমানুষিক কষ্ট স্বীকার করে; যেখানে ঝড়, জল বজ্রাঘাত সত্বেও বড় দলের খেলার দিন মাঠে একটাও আসন শূন্য থাকে না সেখানে একটা স্টেডিয়াম গড়ার জন্যে তিরিশ বছরের নিষ্ফলতা কি একান্তই অবশ্যম্ভাবী? আই এফ এ. রাজ্যক্রীড়া পরিষদ ও সরকার কি ক্রমাগতই সাধারণকে স্টেডিয়ামের গাজর মুখের সামনে ঝুলিয়ে রেখে তাদের ভুলিয়ে রাখায় মৌরসীপাট্টা গড়ে তুলবেন। এমন একটা মাঠ ও স্টেডিয়াম কি কলকাতার বুকে গড়ে তোলা যায় না যাকে কেন্দ্র করে ফুটবলের শিক্ষণ, প্রশিক্ষণ ও বিনোদন তথা সর্বাঙ্গীণ আন্দোলন দানা বেঁধে উঠতে পারে? অভিজ্ঞতাই প্রমাণ করে জমি ও অর্থ সমস্যা নয়, সমস্যা সদিচ্ছার ও আন্তরিক প্রয়াসের। অ্যালেনবরা কোর্সে যখন একবার সম্মতি মিলেছিল তখন সে প্রস্তাবকে আজও পুনরুজ্জীবিত করার বাধাটা কোথায়? ইডেনের ফাঁকা জমিতে ফুটবলের জন্যে আরেকটা স্টেডিয়াম করে সমস্ত ইডেন উদ্যানকে একটি সর্বার্থসাধক স্টেডিয়াম কমপ্লেক্সএ পরিণত করার প্রস্তাবটাই বা মন্দ কি? আর বিধাননগরের ফাঁকা মাঠতো হাতের কাছেই রয়েছে, কিন্তু কর্ণধার কুম্ভকর্ণদের সজাগ নিদ্রা কোনদিন ভাঙবে কি?

"The individual must die, so that the nation may live. To-day I must die, so that India may live and may win freedom and glory."

—সুভাষচন্দ্র

স্বীকৃতি

শক্তিপদ রাজগুরু

মহীনের চোখের সামনে দিয়ে বাসটা বের হয়ে গেল। একটু দৌড়েছিল ওটাকে ধরার জন্য কিন্তু তবু ধরতে পারেনি। অবশ্য ধরার জায়গাও ছিল না। আজকাল বাসগুলো সব যেন ঠাস বোঝাই হয়েই যাতায়াত করে। লোকজনও বেড়ে গেছে চড়চড়িয়ে। সকলেই চড়ে বেড়াচ্ছে নানা ধান্দায়। ধান্দাও বেড়েছে। ফলে বাসগুলো উপচে পড়ছে। লোকজনও মরীয়া হয়ে, পা-দানি হ্যাণ্ডেল কোথাও বাদ রাখে নি। বাসটা যেন একটা চলমান মানুষের তাল কেৎরে ককিয়ে সারা গতর নাচিয়ে চলেছে মহানগরীর রাস্তায় মানুষের হেনস্থার চলমান প্রদর্শনী হয়ে।

মহীন দাঁড়িয়ে আছে বাসস্টপে। পরের বাসের জন্য। রোদের তাপও বেড়ে উঠেছে। বেশ চড়চড় করছে রোদ। অফিস যেতে আজ দেরী হয়ে গেছে। বেলা করে অফিস ঢুকলে তারও বিশ্রী লাগে। সহকর্মীদের চোখে যেন অন্য একটা চাহনি ফুটে ওটে। নিজে যে কাজে ফাঁকি দিয়েছে এটা মনে হয় বড় বেশী করে।

কিন্তু তার উপায় নেই। আগেও দেরী হতো, এমনি একটু আয়েসী ধাতের মানুষ সে। বিছানা থেকে ঘুম তাড়িয়ে উঠতেই বেলা হয়ে যায়।

অবশ্য রাত্রি তার জন্য গজগজ করে, চায়ের কাপ রইল। ওঠো বলছি। বারবার চা করতে পারবো না। রান্না-বান্না হবে কখন ?

বাজারেও যেতে হবে। মহীনের মনে হয় বেঁচে থাকাটাই ঝকমারি। সকাল থেকেই বাঁচার লড়াই শুরু হয়। আর সেই লড়াই চলে দিনভর, রাত অবধি।

রাত্রিরও অফিস আছে।

ইদানীং রাত্রি বিয়ের পর চাকরীটা ছাড়তে চেয়েছে। কোন ছোট্ট বেসরকারী ফার্মের রিসেপসনিস্ট কাম টাইপিস্টের চাকরী। মালিক সুরেশ ভাটিয়া অবশ্য তাকে চাকরীটা দেবার আগে দেখে শুনেই এই চাকরী দিয়েছিল।

অফিসের পরও দেখেছে রাত্রি ভাটিয়া সাহেব বলে, জরুরী দুটো চিঠি টাইপ করতে হবে রাত্রিজী।

অফিস ফাঁকা হয়ে গেছে কাজ সারতে, রাত্রিও একটু অবাক হয়।

ভাটিয়াজী বলে, আমার গাড়িতেই যেতে পারেন।

সংযত সেই কণ্ঠস্বর। তবু রাত্রির কেমন ভয় ভয় করে। গা বাঁচিয়ে গাড়ির এক কোণে বসে বাড়ি ফিরেছে। অবশ্য বাড়ির কাছে গাড়ি থেকে নামতে পারে নি। পথের মোড়ে নেমে হেঁটে এসেছে।

ক্রমশ দেখেছে রাত্রি, ভাটিয়াজীর চাকরী করতে গিয়ে মানুষের লোভ বাসনার খবরটা। সেটা মাঝে মাঝে কেমন সীমারেখা ছাড়িয়ে যায়।

আর তাই রাত্রির বিয়ের খবর শুনে ভাটিয়াজী খুশি হলেও সেটা যে সত্যি নয় তাও বুঝেছিল রাত্রি। ভাটিয়া বলে,

—এতো ঠিক বাত মিস রায়। বিয়ে তো করবেন জরুর, তবে কাজ-কাম-এ কোন গড়বড় না হলেই ভালো। কোম্পানী তো ব্যবসা করছে।

অর্থাৎ রাত্রির বিয়ের খবর শুনে সুরেশ ভাটিয়া খুশী হতে পারে নি। রাত্রির উপর আর একজন মালিক এসে জুটবে, এটা ভাবতে চায় নি ভাটিয়া।

রাত্রি দেখেছে মহীনকে। ক'বছর তাদের পরিচয়। সেই পরিচয়টা আজ পরিনামে পরিণত হতে চলেছে। মহীন একটা ফার্মে চাকরী করে, অবশ্য সাধারণ একটা চাকরী। রাত্রির স্বপ্নগুলো আজ অনেক ফিকে হয়ে গেছে। যতই দেখছে দুনিয়ার কঠিন রূপ ততই সেই পাওয়ার স্বপ্নগুলো মুছে মুছে যাচ্ছে। তখন ভেবেছিল ভালো অফিসার, ডাক্তার, ইন্‌জিনীয়ারকেই পাবে সে স্বামী হিসেবে। গাড়ি বাংলো না হোক নিদেন সাজানো ফ্ল্যাটও জুটবে। কিন্তু ক্রমশঃ দেখেছে রাত্রি সুরেশ ভাটিয়াদের মতো লোভী মানুষ জুটতে পারে মধুর আশায়, কিন্তু স্ত্রীর মর্যাদা দিতে তেমন কেউ আসে নি।

তাই মহীনকে দেখে মনে হয়েছিল রাত্রির এই উষর জীবনের এতটুকু আশ্বাস হয়তো আশ্রয় হিসেবেই। আর তাই যেন ঘনিষ্ঠ হয়েছিল তারা দু'জনে। মহীনও রাত্রিকে হয়তো ভালবেসেছিল।

কথাটা এখন কেমন বিচিত্র ঠেকে মহীনের কাছে।

ভালবাসা না মিথ্যা একটা ছলনা, না মোহ—এর কোন জবাব আজও পায়

নি সে। তবে মনে হয় সবুজ স্নিগ্ধ দুনিয়াটা এমনি রোদের তাপে জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে গেছে।

মহীন আজও অবশ্য আগেকার জীবনযাত্রার সব ধারাগুলোকেই অব্যাহত রেখেছে, অন্তত রাখার চেষ্টা করে চলে। তবে তখন ছিল একা, বোর্ডিং-এর একটা টং-এর ঘরে একটা তক্তপোষে ছিল তার আশ্রয়। আর একটা পরিচয় ছিল ব্যাচিলার। মেয়ের বাপ-মায়ের কাছে কদর ছিল। নিভার বাবা অসিতবাবু, শ্যামবাজারের বদনবাবু, পাইকপাড়ার শুভো মাসিমা—এরা অনেকেই তখন খোঁজখবর নিতো। পালাপার্বণে নিমন্ত্রণও হতো।

নিভার মা তো মেয়েকে নিয়ে ম্যাটিনিতে সিনেমা দেখার অনুমতি দিয়েছিল, কিন্তু সেই আদর যত্ন খবর নেওয়ার পালা সব চুকে গিয়েছিল রাত্রিকে নিয়ে সংসার পাতার পর থেকেই।

নিভার মা এরপর পাঁচমাথার মোড়ে দেখা হতে মুখ ঘুরিয়ে চলে গিয়েছিল। বদন বাবু অপিসে বেশ হাঁকডাক করেই বলেছিল আজকাল ছেলেরাও এক একটা আস্ত রামছাগল। বিয়ে করবে সেখানেও কিনা পয়সার ধান্দা। আরে বাবা—ঠকবি শেষ কালে বারমুখো বউ নিয়ে। তুইও স্বাধীন, সেও স্বাধীন। সাধু থাকবে ক'দিন।

বদনবাবু অবশ্য আর তেমন ঘনিষ্ঠতাও করে নি।

অর্থাৎ হারিয়ে গিয়েছিল সেই পরিবেশ আর সম্পর্কগুলো। মহীন তবু বাইরের পরিচয় টুকুকে ভুলে নিজের ঘরে একটি মেয়েকে নিয়ে সুখী হতে চেয়েছিল, রাত্রিকে নিঃশেষে পেতে চেয়েছিল সে। পুরুষ চায় নারীর উপর সম্পূর্ণ অধিকার।

কিন্তু আজকের দিনে এইখানেই ভুল করেছিল মহীন।

বাস একটা দেখা দিয়েছে। রাস্তার ওদিকে দাঁড়িয়েছে ট্রাফিক সিগন্যাল পেয়ে, আর এই স্টপেজে দাঁড়ানো মানুষগুলো হুড়মুড় করে সবাই দল বেঁধে দৌড়লো যেন একদল ডাকাত লুটেরা কোন শাঁসালো আরোহীর সন্ধান পেয়েছে নির্জন পথে। তার উপর হামলা করার জন্য হন্তে হয়ে দৌড়েছে।

স্টপেজে এসে থামার অবকাশও দিতে চায় না ওরা।

সকলেই ওই একটি মাত্র বাসের জন্য অপেক্ষা করছিল বোধহয়। ওই লোকরাই সব বাসটাকে দখল করে বসবে তার আগে একটু ঠাঁই-এর দরকার

মহীনের। কোন রকমে দাঁড়িয়েই যাবে, তাই মহীনও দৌড়ালা ওদের সঙ্গে রাস্তা পার হয়ে। রাস্তা পার হওয়াও এক সমস্যা।

ট্রাফিক সিগন্যাল পেয়ে ওই রাস্তায় আটকে থাকা গাড়ি, ট্রাক বাস মায় টেম্পো রিক্সা অবধি জলস্রোতের মতো বয়ে চলেছে, এখন রাস্তা তাদের দখলে কিন্তু কে শোনে কার কথা, এদিকের জনতা দিশেহারা হয়ে দৌড়চ্ছে ওই বাসকে ধরার জন্য।

মহীন অবশ্য এখনও তরতাজা রয়েছে। তাই দৌড়ে এসে বাস-এর হ্যাণ্ডেল ধরে ঠেলে ঠুলে ভিতরে ঢুকে গেছে। আর ঠিক চেষ্টা করে করেও ঢুকতে হয় নি। পিছনের উন্মাদ জনতা তাকে ঠেলে চাপ দিয়ে চেপ্টে একেবারে ভিতরে মানুষগুলোর ভিড়ে এনে লেপ্‌টে দিয়েছে।

গেটে তখনও চলেছে তেমনি ঠেলাঠেলি। একবার পুরীর রথযাত্রায় বেড়াতে গিয়েছিল মহীন, সারা রাস্তা ভরে গেছে তীর্থযাত্রীদের ভিড়ে।

রথে জগন্নাথদেবকে দর্শন করে লক্ষ লক্ষ মানুষ যেন মোক্ষলাভ করতে চায়। কিন্তু তখনই মনে হয়েছিল মহীনের এরা মোক্ষ পেতে চায়, মুক্তি পেতে চায় এই জীবনযন্ত্রণা থেকে তারই আশা নিয়ে এসেছে যেন পুনর্জন্ম আর না হয়।

কিন্তু কাউকে যদি এখুনি দেখে মোক্ষলাভ করার কথা বলা যায় কেউ রাজী হবে না। এ দুনিয়ায় সকলেই ভোগবাসনা মিটিয়ে পরে সুবিধে মতো দেখে মোক্ষলাভের পুঁজিটা শিকেয় রাখতে চায় ব্যাঙ্কের ফিক্সড ডিপোজিটের মতো। ওটা নগদ কেউ হাতে পেতে চায় না, মোক্ষ লাভ করতে চায় না, ভরসা চায় মাত্র। কটা দীর্ঘ মেয়াদী কড়ারে। নিদেন মারা পড়লে যেন মিলে যায় তখন।

তবু ভিড় করে ভবিষ্যতের গ্যারান্টিটা আদায় করে সেফ ডিপজিট ভল্টে রেখে দিতে চায় পাকাপোক্ত করে। তাই এত ভিড়।

বাসটা এবার রাস্তা পেরিয়ে আইনমাফিক স্টপেজে এসে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য ওঠার বেশী লোকই উঠে পড়েছে। মহীন ঘড়িটা দেখলো। এগারোটা বেজে গেছে অর্থাৎ এটেনডেন্স রেজিস্টার খাতা বড়বাবুর টেবিল থেকে চলে গেছে ছোট সাহেবের ঘরে আর বোদামুখো বোস সাহেব এতক্ষণে লাল নীল পেন্সিল দিয়ে খাতাটা চিত্র বিচিত্র করে তুলেছে। হয়তো পাতা উলটে তার নামে আরও কয়েকটা লাল টিকে দেখে এবার কাগজে তার নাম লিখে বড়বাবুর কাছে পাঠাবে —'কল ফর হিস এক্সপ্লানেশন।'

দেরী হওয়াটা যেন ফাঁসির তুল্য অপরাধ।

অবশ্য মহীন চেষ্টা করে সকাল সকাল বাড়ি থেকে বের হবার জন্য। আগে রাত্রিও বলতো তাকে, আর মহীনকে ঘুম থেকে তুলে দিয়ে চা এগিয়ে দিতো, নিজে স্নান সেরে আহারের ব্যবস্থায় হিটারে প্রেসার কুকার বসিয়ে দিয়ে তাড়া দিতো—চান করতে যাও। দাড়িটা কামাবে না?

স্বামীর প্রতি এই নজর, তার জন্য রাত্রির ব্যস্ততা, ছোট খাট অনুযোগগুলো কেমন ভাল লাগতো মহীনের। মহীনকে রাত্রিই অফিস পাঠাতো সময় মতো।

কিন্তু আর মহীনের অভ্যাসগুলো কেমন বেয়াড়া। বিকেল হলে আর অফিসে তার মন বসেনা। এককালে কবিতাও লিখেছে তাই কেমন যেন উদাসীন। হয়তো বেপরোয়া ভাবটা রয়ে গেছে ওর মনে। বিকেল পাঁচটার আগেই বের হয়ে পড়ে।

ইডেন গার্ডেন, ময়দান আর গঙ্গার ধারেই বসে থাকে। ফাঁকা মেলায় দিন-শেষের আলো চকোলেট রং হয়ে গাছ-গাছালির মাথা রাঙিয়ে তোলে, গঙ্গার জলে ছোঁ দিয়ে যায় গাঙচিলের দল।

কেমন অলস শ্লথ হয়ে আসে সময়ের বাঁধন।

তাড়া নেই। চোখের সামনে এক-একটি বিচিত্র মুহূর্তকে নতুন করে অনুভব করে মহীন।

তাই সে অফিস পালায়।

বড়বাবু গজরায়, রিপোর্ট হয়ে যাবে মহীন।

বদনবাবু মন্তব্য করে, মহীনবাবুর দুদিকে লেট করার অভ্যাস নেই বড়বাবু। আসেন লেটে আর যাবেন লেট করে। এ কেমন কথা।

মহীন সব কথায় কান দেয় না। এ তার যেন রক্তের সঙ্গে মিশে গেছে।

কোনো বাঁধাধরা ছকে থাকতে পারে না সে।

তাই রিপোর্ট চার্জশিট হলেও স্বভাব তার বদলায়নি। রাত্রিও শুনেছে কথাগুলো ওর অফিসের দুএকজন বন্ধুর মুখে।

রাত্রি বলে সেদিন, এত ইররেস্পনসিবল কেন? এত সকালে বের হয়ে কোথায় চরে বেড়াও? বাড়িও ফেরো না।

মহীনের মন মেজাজটা ভালো ছিলো না। রাত্রিই যেন তাদের সংসারের এই ছন্নছাড়া ভাবের জন্য দায়ী। এখন নাকি রাত্রির প্রমোশন হয়েছে চাকরীতে।

মহীন প্রথম দিকে প্রায়ই বলতো রাত্রিকে,

ওই চাকরীটা ছেড়ে দাও। ঘরসংসার নিয়েই থাকো –

রাত্রি জবাব দিত না, হাসতো মাত্র, হয়তো বলতো—কেন ?

মহীন অবশ্য সঠিক কারণটা জানাতে পারেনি! সে চায় একটি নারীর উপর নিরঙ্কুশ স্বামীত্ব। কিন্তু রাত্রিও নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে আছে, তাই মহীনের এই প্রতিবাদ হয়তো। মনে মনে ভয়ও হয় মহীনের, কিছু হারাবার ভয়।

মহীন এড়িয়ে যেতো, এমনিই ঘরে বাইরে সারা দিন খাটুনী!

রাত্রি ওর জেদ দেখে সেদিন বলেছিল—

প্রমোশন হচ্ছে, এ চাকরী ছাড়ি কি করে ?

মহীন দেখেছিল মাত্র ওকে সন্ধানী চাহনি মেলে। বলে ওঠে বেশ ব্যঙ্গ ভরা স্বরে, তাহলে বস্‌ ওই প্রকাশ ভাটিয়াকে খুশী করেছো বলো ?

কি বললে ? রাত্রি আচমকা কঠিন স্বরে ফেটে পড়ে। চাকরী করা মেয়েদের সহজাত কাঠিন্য, হয়তো ছলনাই তাকে এমনি সচকিত করে তুলেছে। মহীনও কথাটা হালকা ভাবেই বলেছিল কিন্তু, ওকে এই ভাবে ফুঁসে উঠতে দেখে ওর দিকে চাইল।

রাত্রি গজরাচ্ছে—ইতর মন তোমার।

মহীন জবাব দিল না। কিন্তু রাত্রির চোখে যেন দেখছে সে নিষ্পাপ প্রতিবাদ নয়, কপট সতীপনারই আভাস।

কোন রকমে মুখ বুজে খেয়ে উঠে গেল মহীন। রাত্রি বলে চলেছে, এ সংসারের অনেক কিছুই আমার চাকরীর পয়সাতেই চলে, যায় এই ফ্ল্যাটের ভাড়া অবধি আমিই দিই।

মহীনের মনে হয়েছিল প্রতিবাদই করবে সে। কিন্তু আশপাশের সকলেই জানে তারা সুখী পরিবার। পাশের ফ্ল্যাটের অতনুও তাকে হিংসা করে, মিলিদি বলে কপোতকপোতীর মতো কুজনই করে দু'জনে।

—ওদের সেই মনগড়া শান্তির ছবিটাকে বিকৃত করতে চায় না মহীন, রাত্রি যেন জানাতে চায় তার পয়সাতেই মহীনের বিলাস-ব্যসন সুতরাং মহীন যেন তার কাজে বাধা না দেয়, কোন প্রতিবাদ না করে।

আর তার সঙ্গে থাকতে হলে তাকে মুখ বুজেই থাকতে হবে।

কোথায় যেন একটা নীরবতা জমে উঠেছিল। আর গড়ে উঠেছে একটা ব্যবধান। রাত্রিও জেনেছে এটা।

রাত্রি এখন সকাল বেলাতেই বের হয়ে যায়, অফিস থেকে গাড়ি আসে ওকে নিতে। ট্রামে বাসের ভিড়ে ওকে কষ্ট করে যাতে না যেতে হয় তার জন্য মহীন ব্যবস্থাই করতে পারে নি।

ব্যবস্থা করেছে প্রকাশ ভাটিয়া, তার পার্সোন্যাল সেক্রেটারীর পদমর্যাদা র দিকে নজর দিতে হয়েছে তাকে। মহীন সেখানে কালতু একটি মানুষ মাত্র। নিজের অক্ষমতাটাকে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে মহীন, আর তুলনামূলক ভাবে বিচার করলে দেখা যাবে রাত্রিই তার চেয়ে অনেক বড় থাকের ভি-আই-পি, কারণ তার অফিসের জয়ন্তবাবুই সেদিন ধরেছিল তাকে।

—ভাইপোটার একটা গতি করে দেন মহীনবাবু, আপনার মিসেস শুনলাম প্রকাশ ভাটিয়ার পি-এ। উনি বললেই হবে।

মায় স্বয়ং বড়বাবু অবধি সমীহ করে তাকে।

মহীনও মনে মনে অবাক হয়েছে এই কঠিন লোকটার বিচিত্র ব্যবহারে। বড়বাবু সেদিন বলে, আপনার অবশ্যি বাইরের কাজকম্ম মানে মিসেসের সঙ্গে পার্টিতে যেতে হয় জানি। আমিও ছোট সাহেবকে বলেছি, আপনার একটু দেরী হবে।

মহীন রায় অবাক হয়। বড়বাবু তাকে খাতির করে চা দিয়ে নিজের টেবিলে বসিয়ে বলে,

—নিন চা খান। আরে মশাই কাজ তো হবেই।

গলা নামিয়ে বড়বাবু জানায়, বড় ছেলেটাকে তো এখানে ঢুকিয়েছি। ছোটটার একটা গতি করে দিতে হবে আপনাকে মহীনবাবু, মিসেসকে বললেই হবে, একটা গতি করে দেন।

মহীন অবাক হয়ে চাইল।

মনে হয় সব কেমন উলট পালট হয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ ব্রেক কষেছে। বাসটা থমকে দাঁড়ালো।

বাঁদিকের সিগন্যাল-এ সারবন্দী গাড়ি দাঁড়িয়েছে। হঠাৎ ওপাশের ঝকঝকে নতুন মডেলের গাড়িটার দিকে নজর পড়তে চমকে ওঠে মহীন।

না। ভুল সে দেখে নি।

গাড়ির মধ্যে বসে আছে রাত্রি। বব্ করা চুল—ঠোঁটে গালে রং-এর আভাস, পরনের শাড়িখানা বুকের উপর থেকে খসে পড়েছে। ক্রীম কালার ব্লাউজের রং রাত্রির যৌবনবতী দেহের রং-এ মিলিয়ে গেছে। এ যেন মোহময়ী কোন এক অন্য নারী।

পাশের মোটকা মতো লোকটাই বোধ হয় প্রকাশ ভাটিয়া। ওর হাতটা রাত্রির কোমর জড়িয়ে রয়েছে, রাত্রির চোখে মুখে একটা বিচিত্র আবেশ।

প্রকাশ ভাটিয়া সে নেশার আবেশে যেন হারিয়ে গেছে।

বাস-এর মধ্যে কে একজন বলে ওঠে।

—লে বাবা। মজা লুটে লে। আর মেয়েগুলোও হয়েছে তেমনি বেহায়া। বে করে সিঁথিতে সিঁদুর দিয়ে সতী সাজা হয়েছে!

কথাটা যেন মহীনের গালে চড়ের মতো এসে বাজে।

বাসটা আবার চলতে সুরু করেছে।

অবশ্য এত দেরী করে অফিসে এসেও দেখে মহীন—তার নাম-এর ঘরে লাল চিকে পড়েনি। বড়বাবু বলে,

—সই করুন মহীনবাবু। আর কথাটা মিসেসকে বলেছিলেন?

মহীন সই করে এবার পরম দরদীর মতো বলে,

—বলেছি। উনি বলেছেন সময় হলেই জানাবেন। বড়বাবু কৃতার্থ হয়ে বলে, একটু চেষ্টা করুন মহীনবাবু। বড় উপকার করা হবে।

মহীনের চোখের সামনে ভেসে ওঠে চলন্ত গাড়ির সেই দৃশ্যটা। তবু মহীনকে এই পরিচয়টা বজায় রাখতে হচ্ছে—হবেও।

"গাহি সাম্যের গান—
মানুষের চেয়ে বড় কিছুই নাই, নহে কিছু মহীয়ান্
নাই দেশ কাল পাত্রের ভেদ অভেদ ধর্ম জাতি,
সব দেশে সব কালে ঘরে ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি।"

—কাজী নজরুল

ছেলেধরা

নটরাজন

রাজ্যের বিরক্তি নিয়ে সেদিন একটু বেলা করেই ঘুম থেকে উঠ্‌লেন নিরাপদবাবু। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলেন, প্রায় আটটা। এই এত বেলায় বাজারে যাওয়া মানেই বাজারের প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্যে হাবুডুবু খাওয়া। ঠেলাঠেলি, গুঁতোগুঁতি তো আছেই, তার ওপরেও আছে বাজারের ভালো টাট্‌কা জিনিসটি হাতছাড়া হয়ে যাওয়া। তাই খুব সকালে ঘুম থেকে উঠে বাজারটি সেরে ফেলাই তাঁর প্রতিদিনের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান কাজ।

একটা হাই তুলে বারান্দায় এসে দাঁড়ান নিরাপদবাবু। সামনে ছোট মাঠখানার দিকে তাকিয়ে বিরক্তি আরও বেড়ে ওঠে তাঁর। মাঠ না বলে একখানি বড়সড় উঠোন বলাই ভালো। তিনদিকে সরকারী হাউজিং এস্টেটের ভাড়াবাড়ি। একদিকে দেয়াল। দেয়ালের ওপাশেই বড় রাস্তা। এই হাউজিং এস্টেটের একখানা ফ্ল্যাটেরই বাসিন্দা নিরাপদবাবু।

বারান্দাটা উত্তরমুখী। তাই এদিকে রোদ পড়ে না কখনও। রেলিং এর ওপর হাত রেখে নিরাপদবাবু তাঁর রাতের ঘুমের ব্যাঘাত যারা ঘটিয়েছিল তাদের খুঁজতে থাকেন। কিন্তু কাউকেই নজরে পড়ে না সেই মুহূর্তে। রাতভর অন্যের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটিয়ে তারা নিজেরা বোধহয় এখন ঘুমুতে গেছে। রাগে নিরাপদবাবুর সর্বাঙ্গ রি-রি করতে থাকে। ইচ্ছে হয় তাদের লাঠিপেটা করতে। কিন্তু তার উপায় নেই। দয়ার অবতারেরা কাছেই রয়েছে। নিরাপদবাবুর লাঠির জবাবে সেই অবতারেরা হয়তো লোহার ডাণ্ডা নিয়েই তাড়া করবে।

নিরাপদবাবু কোনকালেই এই শ্রীকৃষ্ণের জীবদের পছন্দ করেন না। ওদের দেখলেই তাঁর হাতদুটো নিস্‌পিস করতে থাকে। বিশেষ করে ওদের ঐ পরিকল্পনাহীন বংশবৃদ্ধি তাঁর দু'চোখের বিষ। এ নিয়ে পাড়ার একজন কুকুর-প্রেমির কাছে একদিন মুখ ফস্কে কি যেন একটা মন্তব্য করে ফেলেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সেই ভদ্রলোক নিরাপদবাবুর মুখের দিকে একটু তীর্যক দৃষ্টিতে তাকিয়ে

বলেছিলেন, আপনার নিজের সন্তান-সন্ততির সংখ্যা তো সাত, তাই না? লজ্জায় মুখখানা লাল করে সেখান থেকে পালিয়ে এসেছিলেন নিরাপদবাবু।

এই বেওয়ারিশ একদঙ্গল কুকুরের চাইতে এখানকার কুকুর-দরদী মানুষগুলোর ওপরই বেশি রাগ হয় নিরাপদবাবুর। বিশেষকরে তিন নম্বর ফ্ল্যাটের ঐ গাট্টাগোট্টা মেয়েটার ওপর যে নাকি সর্বদাই ফ্রক্ পরে খুকী সেজে থাকতে ভালো বাসে অথচ সময়মত বিয়ে হলে দুই ছেলের মা হতে পারতো। সেই গাট্টাগোট্টা মেয়েটা প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যা বারান্দায় দাঁড়িয়ে ঐ বেওয়ারিশ কুকুরগুলোকে ভাত-রুটি খাওয়ায়। তার দেখাদেখি ইদানীং আরও কয়েকজন কুকুরভোজন করিয়ে পুণ্য অর্জন করতে শুরু করেছে। ফলে কুকুরের সংখ্যা দিনে দিনে বাড়ছে বৈ কমছে না মোটেই। রাতভর কুকুরগুলো ঐ মাঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার চেঁচামেচি করে। এই চিৎকার কখনও বা খাদ্যবস্তুর ভাগাভাগি নিয়ে কখনও বা সঙ্গিনী লাভের উদ্দেশ্যে কিম্বা অন্যকোন কুকুরের হঠাৎ বেপাড়ায় ঢুকে পড়ার বিরুদ্ধে।

কানের কাছে কুকুরের ঐ চিৎকারে পাড়ার অন্য সবাই ঘুমুতে পারলেও নিরাপদবাবু পারেন না। আর, পারেন না বলেই ওদের ওপর তাঁর নিজের রাগ কিম্বা আক্রোশই বেশি। কিন্তু নিরাপদবাবু নিরুপায়। তাঁর মাঝে মাঝে মনে হয়, এই এলাকার মানুষগুলো হঠাৎই যেন অতিরিক্ত কুকুর-পাগল হয়ে উঠেছে। অবশ্যি পাগল-কুকুরের হাতে পড়লে তাদের দশা কি হবে তা' তিনি বলতে পারেন না। তবে তাঁর মাঝে মাঝে মনে হয় পাড়ার ওই কুকুর পাগলদের পাগল-কুকুরের হাতেই পড়া উচিত। তা'হলে বোধহয় খানিকটা শিক্ষা হয় ওদের। বিশেষ করে ঐ তিন নম্বর ফ্ল্যাটের খুকী-বেশী সোমত্থ মেয়েটার।

নিরাপদবাবুর এই কুকুর-বিদ্বেষী হয়ে ওঠার যে কোন কারণ নেই তা' নয়। তবে তিনি নিজে সেই কারণটাকে আমল দিতে চান না। বলেন, রাস্তার কুকুর থেকেই নানারকম রোগ ছড়ায়। কিন্তু তাঁর বাড়ির লোকেরা জানে ছেলেবেলায় তাঁকে নাকি একবার একটা পাগলা কুকুর কামড়েছিল। জলাতঙ্ক রোগের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে হাসপাতালে গিয়ে পেটের মধ্যে চৌদ্দটা ইনজেকশন নিতে হয়ে ছিল তাঁকে। আর সেটাই তাঁর কুকুর-বিদ্বেষের আসল কারণ।

সরকারী ফ্ল্যাটবাড়ির এই বারোয়ারী উঠোনে ক্রমবর্দ্ধমান একদঙ্গল কুকুরকে দেখেন, আর মনে মনে তাদের এখান থেকে তাড়াবার পরিকল্পনা করেন

নিরাপদবাবু। কখনও মনে হয় কর্পোরেশনের কুকুর-ধরা বাবুদের একবার খবর দেন, কখনও বা ওদের লাঠিপেটা করে তাড়াবার ফন্দি আঁটেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোন পরিকল্পনাই তাঁর ধোপে টেঁকে না। পাড়ার কেউ কেউ আবার নিরাপদবাবুর এই কুকুর-বিদ্বেষের মধ্যে কুকুর-প্রেমের গন্ধ পান। তাঁদের মতে নিরাপদবাবুর অন্তরের অন্তঃস্থলে কুকুরের ওপর একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে বলেই বাইরে তাঁর এই কুকুর বিদ্বেষের আবরণ। মিষ্টির মিষ্টত্ব অতিরিক্ত বাড়িয়ে দিলে তা' যেমন স্যাকারিনের মত তেঁতো হয়ে ওঠে, নিরাপদবাবুর অবস্থাও নাকি ঠিক তাই। এ ধরণের কথা কানে এলেই তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠেন। মনে মনে কুকুর জাতির ও সেই সঙ্গে এই ধরনের মনোবিশ্লেষনীদের মুণ্ডুপাত করেন।

সেদিন নিরাপদবাবু বাজারের থলেটা নিয়ে গেট দিয়ে বেরোতে যাবেন, হঠাৎ কোত্থেকে এক২ত্তি একটা কুকুরের বাচ্চা এসে পিছু নিলে তাঁর। বিরক্তিতে সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠলো নিরাপদবাবুর। ইচ্ছে হলো একটা লাথি মেরে বাচ্চাটকে দশহাত দূরে ছিটকে ফেলে দিয়ে তিনি বাজারের দিকে চলে যান কিন্তু তাতেও বিপদ কম নয়। বাচ্চাটা একরত্তি হলে কি হয়, ওর কণ্ঠস্বর মোটেই মৃদু নয়। কেঁউ কেঁউ শব্দে চিৎকার করে উঠে পাড়ার লোক জড়ো করে নাস্তানাবুদ করে ছাড়বে। তার চাইতে কুকুরের বাচ্চাটাকে অগ্রাহ্য করে নিজের কাজে চলে যাওয়াই ভালো।

কিন্তু বাচ্চাটা মুশকিল করে তুললো, কিছুতেই সঙ্গ ছাড়ে না। এখন উপায়?

হঠাৎ একটা কথা মনে হতেই মনটা খুশি হয়ে উঠলো নিরাপদবাবুর। বাচ্চাটা চলুক তাঁর সঙ্গে তিনি আর বাধা দেবেন না। বাজারে ভিড়ের মধ্যে নিশ্চয়ই এইটুকু বাচ্চাকুকুর হারিয়ে যাবে। পথ চিনে আর তাঁদের পাড়ায় ফিরে আসতে পারবে না। এতে অন্ততঃ একটা কুকুরের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। আর ভাবতে গেলে এটা তো ঠিক একটা কুকুরের ব্যাপার নয়। একটা কুকুর মানেই ভবিষ্যতের একদল কুকুরের জনক কিম্বা জননী। কাজেই একটার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া মানে অনেকগুলোর সম্ভাবনাকে নিশ্চিহ্ন করা।

বাজারের থলেটা দুলিয়ে দুলিয়ে পথ চলতে থাকেন নিরাপদবাবু। আর তাঁর পেছনে পাল্লা দিয়ে গুটি গুটি পায়ে দৌড়ুতে থাকে বাচ্চা কুকুরটা। তাঁর দেহের গন্ধ কিম্বা বাজারের থলেটার দুলুনির মধ্যে কোনটার আকর্ষণে যে কুকুর ছানাটা তাঁর সঙ্গে চলেছে তা ঠিক বুঝতে পারেন না তিনি।

রাস্তায় একজন পরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, ভদ্রলোক এর মধ্যেই থলে বোঝাই বাজার নিয়ে ফিরছিলেন। ভদ্রলোককে না দেখার ভান করে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু পারলেন না; ধরা পড়ে গেলেন।

—এই যে নিরাপদবাবু, বাজার যাচ্ছেন বুঝি?

সেই চিরাচরিত কথা আরম্ভ করার উপক্রমণিকা। নইলে থলে হাতে বাজারের দিকে যেতে দেখেও এমন প্রশ্ন অবান্তর।

—হ্যাঁ ভাই, একটু দেরি হয়ে গেল আজ।

—ঘুমিয়ে পড়েছিলেন বুঝি? তা' আর ঘুমের দোষ কি? লোড্‌শেডিংয়ের ঠেলায় সারারাত তো দু'চোখের পাতা এক করার উপায় নেই। কাজেই শেষরাতের দিকে ঠাণ্ডায় ঘুমিয়ে পড়াটাই স্বাভাবিক।

—তা' যা বলেছেন। ভদ্রতার খাতিরে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ভদ্রলোকের সঙ্গে দু'টো কথা বলতেই হয় নিরাপদবাবুর। কিন্তু কথার ফাঁকেও তিনি লক্ষ্য রাখেন কুকুর ছানাটার ওপর। ওটা তাঁর পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে মুখ তুলে তাদের দিকে এমন ভাবে তাকিয়ে আছে যেন তাদের কথাবার্তা স্পষ্ট বুঝতে পারছে। মাঝে টিক্‌টিকির লেজের মত ছোট্ট সরু লেজটি নাড়ছে কেবল।

কুকুর-ছানাটার ওপর নজর পড়তেই বলে ওঠেন, এটাকে পুষছেন বুঝি?

মনে মনে প্রমাদ গনেন নিরাপদবাবু। তাড়াতাড়ি জবাব দেন, আরে দূর—দূর! এটা কোত্থেকে এসে জুটলো কে জানে?

ভদ্রলোক একটু হেসে বললেন, জুটেই যখন গেছে তখন একটু সাবধানে যান। রাস্তায় ঐ দৈত্যের মত ডবল ডেকারের তলায় পড়ে কুকুরের জীবটি বেঘোরে প্রাণ না হারায়।

—তা' তো বটেই—তা' তো বটেই। বলতে বলতে আবার পা বাড়ান নিরাপদবাবু। ভদ্রলোকের কথায় খেয়াল হয় তাঁর। সত্যিই তো কুকুরছানাটা যদি বাসের তলায় চাপা পড়ে তা'হলে যে দায়ী হতে হবে তাঁকেই। ইচ্ছে করে ওটাকে সঙ্গে না নিয়ে এলেও মনে মনে তো তিনি তাই চাইছিলেন এতক্ষণ।

পথ চলতে চলতে নিরাপদবাবু এবার ঐ একরত্তি কুকুর ছানাটার হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভের পথ খুঁজতে থাকেন। মনে মনে নিজের পক্ষে সওয়াল করতে থাকেন—আমি এটার জন্যে দায়ী হতে যাবো কেন? আমি তো সঙ্গে আনি

নি। কিন্তু নিজের পক্ষে এই সওয়াল যে অর্থহীন তা' স্পষ্টই টের পান তিনি। সহসা ঘুরে দাঁড়ান নিরাপদবাবু। একপা এগিয়ে গিয়ে ধমকে ওঠেন কুকুর ছানাটাকে। দু'পা পিছিয়ে যায় সেটা। আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটতে থাকেন তিনি। ঘাড় ফিরিয়ে দেখেন বাচ্চাটা আবার তাঁর পিছু নিয়েছে।

এ যে মহা মুশকিল হলো! তিনি ছাড়তে চাইলেও কম্‌লি যে ছাড়ছে না তাঁকে। হঠাৎ চলার গতি বাড়িয়ে দেবেন নাকি নিরাপদবাবু? দেখা যাক্ ঐ কুকুরের বাচ্চা কি করে। ওটাকে তাঁর নিজের সঙ্গ-ছাড়া করতেই হবে। ঐ জীবটির ভার নিতে যাবেন কেন তিনি? তিনি তো ওটাকে সঙ্গে আনেন নি। ওটা নিজেই এসেছে তাঁর সঙ্গে। হ্যাঁ, স্বীকার করছেন তিনি যে এতে তাঁর সম্মতি ছিল। কিন্তু সম্মতি থাকা মানেই তো আর ওটাকে ভুলিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে আসা নয়। কোন্ এক অজ্ঞাত কারণে জীবটি তাঁর সঙ্গ নিয়েছে। এজন্যে তিনি নিজে দায়ী হতে যাবেন কেন? কুকুরটা যদি গাড়ি চাপা পড়ে মরেই যায়, তা'হলেই বা তাঁর দায়িত্ব কোথায়?

মৃত্যু—বড়ই ভয়ঙ্কর ঐ মৃত্যু। সে মানুষেরই হোক্ কিম্বা পশুরই হোক্। মৃত্যুর কথা মনে হতেই মনটা খারাপ হয়ে উঠে নিরাপদবাবুর। এই মুহূর্তে বাসের তলায় চাপা পড়ে ঐ বোকা কুকুর ছানাটার মৃত্যু ঘটলে জগতের কেউ যে তাঁকে দায়ী করবে না তা' তিনি জানেন। কেউ আঙ্গুল তুলবে না তাঁর দিকে। এই জনবহুল রাস্তায় একটা কুকুর-ছানার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে সোরগোল তোলার মত অঢেল সময় কারুরই নেই। কিন্তু তাঁর দিকে এই আঙ্গুল না তোলাটাই যে নিজের বিবেকের কাছে আরও বেশি দায়ী করে তুলবে তাঁকে। অপরাধী বলে কেউ সনাক্ত করলে তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠার সুযোগ থাকে, কিন্তু যেখানে নেই কোন সনাক্তকরণ সেখানে যে বিবেকের দংশন বড়ই কঠিন হয়ে দেখা দেয়। অব্যক্ত সনাক্তকরণ যে সেই ব্যক্ত সনাক্তকরণের চাইতে অনেক বেশি ভয়ঙ্কর।

না, আর দেরি নয়। এই ভিড়ের মধ্যেই কুকুর ছানাটার কাছ থেকে পালাতে হবে তাঁকে। নিরাপদবাবু একবার ঘাড় ফিরিয়ে কুকুর-ছানাটার দিকে তীর্যক চোখে তাকান। সেটা তখনও পরম বিশ্বাসভরে তাঁর পিছু পিছু হেঁটে আসছে। সহসা, চলার গতি বাড়িয়ে দেন তিনি। লম্বা পা ফেলে হন্ হন্ করে হাঁটতে থাকেন তিনি। হাঁটা তো নয়, যেন দৌড়চ্ছেন নিরাপদবাবু। একটা ছোট্ট কুকুরের বাচ্চার হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে ঝড়ের বেগে ছুটে চলেছেন।

বাজারের গেটের কাছে এসে নিরাপদবাবু একটু থামেন। তাকিয়ে দেখেন কুকুর ছানাটা তখনও গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে আসছে। তবে এবার আর ওটা তাঁর পিছু পিছু আসছে না। অন্য একজনের পিছু নিয়েছে। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়েন নিরাপদবাবু। যাক্ এতক্ষণে ঐ জীবটিকে তিনি ফাঁকি দিতে পেরেছেন। ওর ভালো-মন্দের জন্যে এই মুহূর্ত থেকে আর তাঁকে দায়ী হতে হবে না। মনের আনন্দে বাজারে ঢুকে পড়েন।

পেটমোটা বাজারের থলেটা নিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়াতেই সেই কুকুর ছানাটার কথা মনে পড়ে যায় নিরাপদবাবুর। ওটা গেল কোথায়? এই অপরিচিত লোকারণ্যে ওটা কার পিছে পিছে ঘুরে বেড়াচ্ছে? নাকি পথ হারিয়ে কেঁউ-কেউ শব্দে কাঁদছে? কুকুর-ছানাও মানুষ-ছানার মত কাঁদে নাকি?

নিরাপদবাবু থলি হাতে পথে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকান। না, কোথাও দেখা যাচ্ছে না সেই জীবটিকে। কান খাড়া করে শুনতে চেষ্টা করেন তার কণ্ঠস্বর। কিন্তু গাড়ী-ঘোড়ায় শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না। যাগ গে, একটা বেওয়ারিশ কুকুর-ছানার জন্যে রাস্তায় দাঁড়িয়ে চিন্তা করার কোন মানে হয় না। নিরাপদবাবু বাড়ির পথ ধরেন।

রাস্তায় যেতে যেতে ভাবতে থাকেন তিনি, ভালই হয়েছে। একটা আপদকে অন্ততঃ তিনি তাঁদের পাড়া থেকে তাড়াতে সমর্থ হয়েছেন। এতেই তাঁর খুশি হওয়া উচিত। কিন্তু কেন যেন ততটা খুশি হতে পারছেন না নিরাপদবাবু। যেতে যেতে এদিক ওদিক তাকাচ্ছেন, যদি সেই জীবটিকে কোথাও দেখা যায়। কিন্তু না, কোথাও নেই সেই কুকুর-ছানাটা। হয়তো কেউ এতক্ষণে ওটাকে আদর করে ধরে নিয়ে গেছে। কুকুরপ্রেমির তো অভাব নেই। হয়তো কেউ ওটাকে নিজের হেপাজতে নিয়ে সামান্য একটু দুধ ওর মুখের সামনে ধরেছে, আর বাচ্চাটাও তার ছোট্ট লেজটি নাড়তে নাড়তে চুক্ চুক্ করে খাচ্ছে সেই দুধটুকু। ভালই হয়েছে। বেপাড়ায় কোন সহৃদয় মানুষের হেপাজতে বেঁচে-বর্তে থাকুক সেই কুকুরছানাটা। তাতে কোনই আপত্তি নেই নিরাপদবাবুর। আহা শত হলেও কৃষ্ণের জীব! ওর মৃত্যু কামনা করবেন কেন তিনি? কিন্তু দুধ খাওয়ার বদলে এতক্ষণে যদি তাকে ডবল ডেকার রাস্তার মাঝখানে থেঁত্লে ফেলে থাকে? নিরাপদবাবু কথাটাকে যতই মন থেকে তাড়াতে চেষ্টা করেন ততই যেন সেটা তাঁর মনটাকে আরও জোরে চেপে ধরে। যতই কোন সহৃদয়

ব্যক্তির ঘরে ওর আশ্রয় লাভের সম্ভাবনার কথা মনে করতে চেষ্টা করেন, ততই তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠতে থাকে ডবল ডেকারের বড় বড় চাকার ছবি। মনটা আবার খারাপ হয়ে ওঠে, অপরাধবোধ অনুভব করতে থাকেন।

রাস্তার ওপর একটু দূরে গোটাকয়েক কাক জড়ো হয়ে কি যেন খাচ্ছিল। দৃশ্যটা চোখে পড়তেই নিরাপদবাবুর হৃদপিণ্ডটা হঠাৎ ধড়াস করে ওঠে। সেই কুকুর ছানার থেঁতলানো দেহটা দিয়ে ভোজ শুরু করেছে নাকি কাকের দল? না, তা' নয়। কোন অসতর্ক ব্যক্তির হাত থেকে খসে পড়া একঠোঙা মুড়ি ছড়িয়ে পড়েছে রাস্তার মাঝখানে। তা' নিয়েই কাকেদের এই ভোজ।

মনটা একটু আশ্বস্ত হয় নিরাপদবাবুর। কব্জি ঘুরিয়ে হাতঘড়িটা একবার দেখেন তিনি। দেরি হয়ে গেছে। বাড়ি ফিরে অনেক কাজ তাঁর। দাঁড়ি কামানো এখনও বাকি, খবরের কাগজটার ওপরও একবার চোখ বুলোতে হবে। তারপর স্নানাহার সেরে সোজা অফিস।

বাজারের থলি নিয়ে গেট দিয়ে ঢুকতে যাবেন, হঠাৎ রাস্তার মাঝেই দাঁড়িয়ে পড়েন নিরাপদবাবু। একটি ধাড়ী কুকুর দাঁড়িয়ে আছে গেটের সামনে। কুকুরটার পেটের নীচে স্তনের সারি ঝুলে পড়েছে। এটাকে চেনেন নিরাপদবাবু। সম্প্রতি গুটি কয়েক বাচ্চার মা হয়েছে এই কুকুরটা। বাচ্চা নিয়ে ওকে ঘোরা-ফেরা করতেও দেখেছেন। কুকুরটা গেটের সামনে দাঁড়িয়ে মাঝে মাঝে মাটি শুঁকছিল, আর স্থির-চোখে রাস্তার দিকে তাকাচ্ছিল।

বুকটা কেঁপে উঠে নিরাপদবাবুর। কুকুরটা যে তার হারিয়ে যাওয়া বাচ্চাটার জন্যেই এখানে দাঁড়িয়ে আছে তা' বুঝতে মোটেই অসুবিধে হয় না তাঁর। হারিয়ে যাওয়া বাচ্চার গায়ের গন্ধে মা টের পেয়েছে যে তার সন্তান এদিকে গেছে, কিন্তু গেট পর্যন্ত এসে বোধ হয় হারিয়ে গেছে সেই গন্ধ। তাই এই পর্যন্ত এসে সন্তানহারা মা হয়ে উঠেছে দিশেহারা।

পা দুটো ভয়ানক ভারি লাগছে নিরাপদবাবুর। হাতের বোঝাটাকে মনে হচ্ছে অত্যধিক ভারি তাঁর কেবলই মনে হচ্ছিল কুকুরটা যেন তাঁর দিকেই তাকিয়ে আছে। ও যেন চিনতে পেরেছে তাঁকে। বোবা দৃষ্টিতে তাকিয়ে সন্তানহারা মা যেন চরমতম অভিশাপ বাণী শোনাচ্ছে তাঁকে। যেন বলতে চাইছে তুমি, তুমিই সেই ঘৃণিত ব্যক্তি যে নাকি আমাকে করেছ সন্তানহারা।

কুকুরটার চোখের দিকে তাকাতে সাহস পান না নিরাপদবাবু। একটা

ঢোক গিলে মাথা নিচু করে চোরের মত গেট দিয়ে ভেতরে ঢোকেন। চলার ভঙ্গিতে তাঁর অপরাধের জড়তা, মনের মধ্যে তাঁর অপরাধের অনুশোচনা।

ঘরে ঢুকে হাতের বোঝা নামিয়ে রেখে ক্লান্ত মুখে একটা চেয়ারে ধপ্‌ করে বসে পড়েন নিরাপদবাবু। স্ত্রী এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করেন, ওকি অমন করে বসে পড়লে যে? শরীর খারাপ হয়েছে নাকি?

স্ত্রীর প্রশ্নের জবাব না দিয়ে শুষ্ক কণ্ঠে তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, স্কুল ছুটির পরে ছোট খুকীকে আনতে যাবে কে?

—কে আবার আনতে যাবে? ও তো রোজ নিজে নিজেই বাড়ি আসে।

চিন্তিত ভঙ্গিতে বলে উঠেন নিরাপদবাবু, না—না অতটুকু মেয়েকে একা যেতে আসতে দিও না। রাস্তা-ঘাটে বিপদ ঘটতে কতক্ষণ?

জবাব না দিয়ে স্ত্রী তাকিয়ে থাকেন স্বামীর মুখের দিকে।

বিজয় পরাজিত

রবিদাস সাহারায়।

বিজয় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। এই রোদ মাথায় নিয়েই তাকে ফিরতে হবে।

কাঠ ফাটা রোদ। রোদে কাঠ ফাটতে বিজয় দেখেনি, কিন্তু রাস্তায় পিচ গলতে রোজই সে দেখছে। আজ দেখলো আরও নিদারুণ ভাবে। গলা পিচের ওপর দিয়ে রাস্তা পার হতে গিয়ে পায়ের চটিটা আটকে গেল ছিঁড়ে গেল চটিটা।

পা-টা ঘসটে ঘসটে চললো বিজয়। একটা মুচিও সামনে দেখতে পাচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত পায়ের চটি হাতে তুলতে হলো। কারণ, যদিও কিছুক্ষণ পর মুচি পাওয়া গেল, দরে বনলো না। সময় বুঝে দশ পয়সার জায়গায় চাইলো পঞ্চাশ পয়সা। সামান্য এইটুকু কাজের জন্য এতগুলো পয়সা খরচ করতে তার ইচ্ছা হলো না। বিশেষ করে এমন দিনে।

সেই অবস্থাতেই বাড়ি ফিরলো বিজয়। সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে। মন তার একেবারেই ভেঙে গেছে। কারণ বাড়িতে গিয়েই শুনতে হবে নানা অভিযোগ। ছোট ছেলে মন্টু এসে বলবে, বাবা আমার জন্য স্প্রিংয়ের গাড়ীটা এনেছ? মেয়ে অঞ্জলি এসে জিজ্ঞেস করবে, আমার সেই বইটা এনেছ বাবা? অনিতা ধরবে তার তিন মাসের আগেকার সেই শাড়ীর জন্য বায়না। রবীন আশা নিয়ে বসে আছে বাবা তার প্যান্টের কাপড় ঠিক নিয়ে আসবে।

শুধু মলিনাই কিছু চাইবে না। কারণ সে জানে ছেলেমেয়েরা পেলেই তার পাওয়া হলো। কোন মাসেই বিজয় সকলের আশা ঠিকভাবে পূরণ করতে পারে না। কারণ মাইনে পায় সে অল্প, তার উপর এতগুলো ছেলেমেয়ে নিয়ে সংসারের খরচ সে মোটেই কুলিয়ে উঠতে পারে না। তবু মলিনা হয়তো আশা নিয়ে থাকে বিজয়ের মাইনে পাওয়ার দিনটির দিকে।

আজ সেই মাইনে পাওয়ার দিন। অনেক আশা নিয়েই বিজয় অফিসে এসেছিল। কিন্তু ঠিক মাইনের দিনেই দেখলো অফিসের সামনে পুলিশের

হামলা। মালিকের কি একটা চোরাই চালানের হদিস পেয়ে পুলিস অফিস ঘেরাও করেছে।

হতাশ হয়েই বিজয় বাড়িতে ফিরলো। চটিটাও সেলাই করলো না। কারণ পকেটে যা পয়সা আছে তার দাম এখন তার কাছে অনেক।

পায়ের চটি হাতে দেখেই বড় মেয়ে অনিতা বুঝতে পারলো, বাবা আজ মাইনে পায়নি। কিন্তু অমন সর্বনাশ যে হয়ে গেছে তা সে বুঝতে পারেনি।

বিজয় চটি দুটো বারান্দার এক কোণে ছুঁড়ে ফেলে দিল। তারপর ভাঙা টুলটার উপর চুপ করে বসে পড়লো। ভেবেছিল, এবার অভিযোগ নিয়ে পরপর সবাই তার কাছে এসে হাজির হবে। কিন্তু আশ্চর্য, কেউ এলো না।

বিজয় ভাবলো, সবাই কি আত্মমন্ত্রে তার বিপর্যয়ের কথা জেনে গেল নাকি? নইলে এমন ভাবে কারুর তো চুপ করে থাকার কথা নয়।

চুপচাপ বসেই রইলো বিজয়। কিছুক্ষণ পর অঞ্জলি এসে তার কাছে দাঁড়ালো। ধীর শান্ত কণ্ঠে বললো—বাবা, মণ্টুর খুব অসুখ করেছে।

—মণ্টুর অসুখ করেছে? কি অসুখ?

—ঘরে গিয়েই ছাখো। মা ওর পাশে বসে কাঁদছে।

অন্যদিন হলে ছুটে গিয়েই বিজয় দেখতো। কিন্তু আজ যেন গিয়ে দেখতেও ভরসা হচ্ছে না। শুধু জিজ্ঞেস করলো—কি অসুখ, মুখে বলতে পারিস না?

অঞ্জলি বললো—ডাক্তার তো বলেছে খুব খারাপ অসুখ।

—ডাক্তার এসেছিল নাকি? বিজয় অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো—কে আনলো ডাক্তার?

অঞ্জলি বললো—ও ঘরে অর্চনাদির বর এসেছে, সে-ই ডাক্তার নিয়ে এসেছে। ডাক্তারের ভিজিটও সে-ই দিয়েছে বাবা।

সেই কথাটাই যেন আগে শুনতে চেয়েছিল বিজয়। ভিজিটের টাকা যোগাড় হলো কিভাবে। ঘরের অবস্থা তো সে জানে। বিজয় আস্তে আস্তে উঠে ঘরে গেল।

নির্জীব ভাবে শুয়ে আছে মণ্টু। দুষ্টু চঞ্চল এমন ছেলেটি যেন কোন্ জাদু-মন্ত্রের প্রভাবে একেবারে শান্ত নির্জীব হয়ে বিছানায় পড়ে আছে। সকালে বাড়ি থেকে বেরোবার আগেও সে ছুটে গলির মোড় অবধি গিয়ে স্প্রিংয়ের গাড়ির কথাটা বার বার মনে করিয়ে দিয়েছিল।

মলিনা মণ্টুর কপালে জলপটি দিচ্ছে আর পাখার বাতাস করছে। পাশেই রয়েছে এক শিশি মিক্‌চার আর ওষুধের মোড়ক।

অনিতা ঘরের এক কোণে শুয়ে আছে একটা ছেঁড়া পাতলা চাদর মুড়ি দিয়ে। সেদিকে তাকিয়ে বিজয় একটু ক্ষুব্ধ হলো। বললো—ঐ ধাড়ি মেয়েটা শুয়ে আছে কেন অমন করে? ও একটু ছোট ভাইয়ের সেবা শুশ্রূষা করতে পারে না। একটু আগেও তো ওকে বারান্দায় দেখলাম।

মলিনা বললো—ওর তো দু'দিন ধরেই পেটের অসুখ। আজ অসুখটা একটু বেড়েছে।

মনের দুঃখেই যেন বললো বিজয়—দিন দেখে যত অসুখ এসে হাজির হয়েছে। ওর জন্যও ওষুধ এসেছে নাকি?

মলিনা বললো—হ্যাঁ, ওর জন্য ডাক্তার শুধু ট্যাবলেট লিখে দিয়েছে।

—রবীন কোথায়? জিজ্ঞেস করলো বিজয়।

—এতক্ষণ তো এখানেই ছিল—একটু আগে কোথায় যেন গেল।

ভিজিটের টাকা অর্চনার বর দিয়েছে, সে কথা শুনেছে বিজয়। ওষুধের দাম কে দিয়েছে সে কথা আর জিজ্ঞেস করার ভরসা পেল না।

মলিনা কিন্তু প্রত্যাশার দৃষ্টি নিয়ে তাকালো স্বামীর দিকে। আজকে বিজয়ের মাইনে পাবার তারিখ সে জানে। তাই অর্চনার বরের কাছ থেকে টাকা নিতে সে আপত্তি করেনি। কারণ, সে ভেবেছে, বিজয় বাড়ি ফিরলেই টাকাটা ফেরৎ দিয়ে দেওয়া যাবে।

কিন্তু স্বামীর চোখ মুখের অবস্থা দেখে মলিনার কি রকম যেন সন্দেহ হলো। জিজ্ঞেস করলো—আজ মাইনে পাওনি?

বিজয় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল—নাঃ।

কিন্তু এই মাইনে যে আর কোনদিন হয়তো পাওয়া যাবে না তা বিজয় মুখ ফুটে বলতে পারলো না। আগে একটা ভাল কারখানাতেই সে চাকরি করতো। গত বছর ছাটাই হয়ে গেল। তারপর তিনচার মাস বেকার থাকার পর একটা অখ্যাত অফিসে অনেক কষ্টে চাকরি যোগাড় করলো। মাইনে কম। কিন্তু তা-ও ভাগ্যে সইলো না।

বিজয় ঘর থেকে বেরুতে বেরুতে বললো—দাঁড়াও, আমি আসছি।

মলিনা বললো—কোথায় যাচ্ছ আবার? হাত মুখ ধোও, চা খাও।

বিজয় বললো—না। নিখিলের বাড়ি থেকে একটু ঘুরে আসি। ক'টা টাকা তো যোগাড় করতে হবে। অর্চনার বরকে দিতে হবে না?

মলিনা বললো—ভাগ্যিস অর্চনার বর বাড়ি ছিল। সে-ই তো ডাক্তারকে চার টাকা ভিজিট দিল, ওষুধও এনে দিয়েছে তিন চার টাকার। কাল ভোরেই অর্চনার বর চলে যাবে।

বিজয় মনে মনে হিসাব করলো, অন্ততঃ দশটি টাকা তাকে আজকেই যোগাড় করে আনতে হবে

যদিও লজ্জা লাগছিল, তবু খালি পায়েই গেল। তাছাড়া উপায় কি! নিখিল বাড়িতেই ছিল। বোধহয় কোথাও বেরোবার জন্য তৈরী হচ্ছিল সে। বিজয় বললো—দশটা টাকা আমাকে এখনই দিতে হবে নিখিল। ছোট ছেলেটার অসুখ। আজ আমাদের মাইনে হয়নি। কাল হবে—।

নিখিল বললো—তোর বাড়িতে দেখি অসুখ বিসুখ লেগেই আছে রে বিজয়। আজ ছেলের অসুখ, কাল মেয়ের অসুখ—তোর মেয়ে ক'টা?

যেন খোঁচা দিয়েই নিখিল কথাটা বললো। বিজয়ের মনে আঘাত লাগলো সেই কথার খোঁচায়। জবাব দেবার ইচ্ছা ছিল না। তবু অনিচ্ছা সত্বেই বললো—চারটে।

নিখিল বললো—আর একটি বোধ হয় শীগগিরই আসছে। সেদিন তোর বৌকে দেখে তো তাই মনে হলো।

লজ্জায় মাথা নীচু করলো বিজয়। নিখিল বললো—তুই একটা বোকা। দু'বছর আগেই তোকে বলেছিলাম এখনও সাবধান হ। তখন তো তোর চাকরি ছিল। সেই চাকরিটাও আর এখন নেই। নতুন চাকরি করছিস্—মাইনে কম। এতগুলি ছেলে মেয়ে নিয়ে কিভাবে চলবি? এবার তুই মারা যাবি বিজয়—এবার তুই মারা যাবি।

এমন সময় একটি ফুটফুটে ছেলে আর একটি ফুটফুটে মেয়ে সেখানে এসে দাঁড়ালো। ছেলেটি বড়—মেয়েটি ছোট। তারা বললো—বাপী চলো, বেড়াতে যাবে না?

নিখিল বললো—হ্যাঁ, আমি তো তৈরী হয়েই আছি।

বিজয়ের দিকে তাকিয়ে বললো—বিজয়, এই নে, দশটা টাকা তো এখন আমার কাছে নেই। পাঁচটা টাকাই রয়েছে। এই দিয়ে এখন কাজ চালিয়ে নে।

পাঁচটা টাকা বিজয়ের হাতে দিয়ে নিখিল তার ছেলেমেয়েকে নিয়ে বেরিয়ে গেল। এই দু'টিই ছেলেমেয়ে নিখিলের বরাতে নেই—বেশ সুখের সংসার তার।

বিজয় মনে মনে ভাবলো, নিখিল আর সে সহপাঠী-সমবয়সী। কিন্তু দু'জনের মধ্যে তফাৎ আজ অনেক। নিখিল বুদ্ধিমান। তাই জীবনযুদ্ধে সে জয়লাভ করেছে—আর বিজয় পরাজিত।

পাঁচ টাকার নোটটা বিজয়ের হাতে যেন পাথরের মতো ভারী আর অসহ্য মনে হচ্ছিল। রাগে ও অভিমানে ইচ্ছা করছিল, টাকাটা ছুঁড়ে ফেলে দেয়। নিখিল ইচ্ছা করলেই দশটা টাকা দিতে পারতো। এই পাঁচটা টাকায় তার কিছুই হবে না। কিন্তু তবু তাকে নিতে হবে।

মাথা নীচু করে ভাবতে ভাবতে বাড়ির দিকে চললো বিজয়।

শিকার

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়।

শার্দূল রায় শিকার করতে বেরিয়েছেন। বাঁ কাঁধে একটা ভারী এক নলা বন্দুক, ডান কাঁধে ফ্লাস্ক ঝুলছে, গলায় ক্যামেরা, পিঠে একটা খাকী রঙের ব্যাগ, ফ্লাস্কে চা আছে, পিঠের ব্যাগের মধ্যে খাবার। শার্দূল রায়ের পরণে হাফপ্যাণ্ট পায়ে হাঁটু পর্য্যন্ত মোজা আর বুট জুতো, গায়ে হাফ সার্ট, বলতে নেই শার্দূল বাবু বেশ স্বাস্থ্যবান, মোটা এক জোড়া পাকানো গোঁফ আছে। তিনি যে শিকারী তা এক নজরেই চেনা যায়।

শহর ছাড়িয়ে উত্তরে মাইল পাঁচেক গেলে জঙ্গল শুরু হয়। আরো মাইল ছয়েক ভিতরে ঢুকলে গহীন বন, সেখানে জলা আছে। জলার পাড়ের নরম মাটিতে চিতা বাঘ, সম্বরের পায়ের দাগ স্পষ্ট দেখা যায়। হাতি ও আছে।

ভাদ্রমাসের দুপুর বলে জঙ্গলের ভিতরটা বেশ মনোরম। চারিদিকে ঝিকরি মিকরি আলো আর ছায়া দোলে। ছায়ার ভাগটাই বেশী। পথ বলতে কিছু নেই। হাটতে গেলেই লতা পাতা, গাছের ডাল বা আগাছা ভেঙ্গে ফেলতে হয়। পায়ের নীচে মাটি প্রায় নজরেই পড়ে না।

গাছে পাখী ডাকছে, বাঁদর বসে পেট চুলকাচ্ছে, কাটবেড়ালী দৌড়ঝাপ করছে, ডালে ডালে প্রজাপতির হাট বসেছে চারধারে। শার্দূল রায় চারিদিকে নজর রাখতে রাখতে খুব সাবধানে এগোচ্ছেন।

আজ তিনি কী শিকার করবেন জানা নেই। দু'রকম টোটা এনেছেন। পাখিও মারতে পারেন, বাঘ বা হাতি ও। যেটা জোটে কপালে। তবে কিনা এই জোটানোই বড় মুশকিল। শার্দূল রায় শিকার করছেন আজ পনেরো বছর ধরে। তাঁর সাহসের খ্যাতি, আছে, কষ্টসহিষ্ণু বলে তাঁর নাম ডাক আছে, সবাই তাকে ধৈর্য্যশীল লোক বলে জানে, বিপদে তিনি মাথাও খুব ঠাণ্ডা রেখে চলেন। অর্থাৎ একজন সার্থক শিকারীর বারো আনা গুণই তাঁর আছে। অনেক ভেবে চিন্তেও তাঁর একটার বেশি দুটো দোষ পাওয়া যাবে না। তবে এই একটা দোষই সব মাটি করেছে। দোষটা হল তাঁর বন্দুকের নিশানাটা খুব ভাল নয়।

আর এই নিশানার দোষেই গত পনের বছর ধরে একটানা শিকারে বেরিয়েও তিনি খুব একটা বেশী কিছু শিকার করতে পারেন নি। পাখি মারতে ছররা চালালেন তো ঝাড় ঝাড় করে কিছু পাখনা খসে পড়ল, বাঘের মাথা টিপ করে গুলি মারলেন, একটা হনুমানের লেজ আধখানা কেটে খসে পড়ল। তারপর সেই হনুমানের হাতে থাবড়া খেয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে তাঁকে বাড়িতে ফিরতে হলো। একবার একটা বুনো হাতিকে দেখে খুব তাঁক করে বন্দুক চালিয়েছিলেন। তাতে হাতিটার কান দুটো ফুটো হয়ে যায় আর তাড়া খেয়ে শার্দুল এমন দৌড় দিয়েছিলেন যা এখনো বিশ্বরেকর্ড।

তবু ধৈর্যশীল শার্দুল রায় নিয়মিত শিকারে বেরোন, যেমন আজ বেরিয়েছেন।

ঘুরে ঘুরে বেশ ক্লান্ত লাগছিল, শার্দুল রায় একটা গাছের তলায় জিনিসপত্র নামালেন। ব্যাগ থেকে একটা শতরঞ্চী বের করে পাতলেন, একটা ফু দেওয়া বালিশ ফুলিয়ে তাতে ভর দিয়ে আধ শোয়া হয়ে আরামে চা খেলেন, তারপর খাবারের কৌটো বের করে লুচি আর আলুর দমের কাঁড়ি উড়িয়ে দিতে লাগলেন। খেয়েদেয়ে পেটটাকে ঠাণ্ডা করে তিনি একটা চুরুট ধরিয়ে বসে বসে তাঁর শিকারী জীবনের নানা দুঃসাহসিক ঘটনার কথা ভাবতে লাগলেন। পনেরো বছরে কিছুই প্রায় মারতে পারেন নি তিনি। কিন্তু অভিজ্ঞতা তো কম হয়নি। আধ মাইল দুর দিয়ে বাঘ হেঁটে গেলেও তিনি গন্ধ পান। আশ পাশের গন্ধ শুঁকে তিনি বলে দিতে পারেন কোনটা হরিণ বা সম্বর কোনটা বুনো মোষ বা সাঁওতাল শুয়োর, কোনটা হাতি বা গণ্ডার।

বালিশে মাথা রেখে ভাবতে ভাবতে ঢুলুনী এল, শার্দুল ঢুলতে লাগলেন।

অনেকক্ষণ নিরাপদে ঘুমালেন শার্দুল। ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও নিজের নিশানার দোষ নিয়ে ভাবছিলেন। মনটা বড় খারাপ। এতবড় শিকারী হয়েও শুধু হাতের টিপ নেই বলে আজও কিছু শিকার করা হলো না। শহর শুদ্ধু লোক এমনকি তাঁর বড় ছেলে মেয়েরাও তাঁকে নিয়ে হাসাহাসি করে। ভগবান সবাইকে সব কিছু দেন না। শার্দুলকে সব দিয়েও ভগবান এই এই একটা জিনিস দেন নি।

হঠাৎ একটা উল্টো বাতাস বয়ে গেল বনের ভিতর দিকে, আর সেই বাতাসে ভেসে এল একটা অদ্ভুত গন্ধ।

তিনি জঙ্গলে চলে ফিরে অভ্যস্ত, সব গন্ধই তাঁর চেনা। কিন্তু এ গন্ধটা এর আগে জঙ্গলে কখনো পেয়েছেন বলে মনে পড়ল না। ঘুমের মধ্যেই গন্ধ পেয়ে তিনি চমকে উঠে পড়লেন।

মুহূর্তের মধ্যে জিনিসপত্র গুছিয়ে বন্দুক হাতে উঠে দাঁড়ালেন। খুব সর্তকতার সঙ্গে জঙ্গলের ভিতর এগিয়ে যেতে লাগলেন। চোখে শ্যেন দৃষ্টি সমস্ত শরীরে পাকা শিকারীর হাবভাব। গন্ধটা আসছিল জলার দিক থেকেই। বড় অদ্ভুত গন্ধ। খুবই চেনা আবার খানিকটা অচেনাও। খুব সর্তক ভাবেই পা টিপে টিপে এগোতে লাগলেন তিনি। ক্রমে জঙ্গল পাতলা হতে লাগল। বড় বড় গাছ আর নেই। ছোট ছোট ঝোপ জঙ্গল। তার পরেই নরম মাটি। তার পরেই বিশাল জলা। যত জলার কাছ আসছেন ততই গন্ধটা তীব্র হচ্ছে। আর শার্দুল ততই চনমনে হয়ে উঠেছেন।

জলার ধারে নরম মাটিতে বাঘের পায়ের ছাপের পাশে পাশে শার্দুলের বুটের ছাপও গভীর ভাবে অঙ্কিত হতে লাগল। তিনি এক পা দু'পা করে এগোতে লাগলেন, বাঁ দিকে গেলে গন্ধটা কমে আসছে। ডান দিকে এগোলে গন্ধটা তীব্র হচ্ছে।

শার্দুল অনেকক্ষণ ধরে বাতাসে শুঁকে গন্ধের উৎসটা কোথায় তা বুঝে নিলেন। তারপর খুবই সর্তক ভাবে ডান দিকে এগোতে লাগলেন। খ্যাক করে একটা হরিণ কেশে উঠল। দূরে একটা হাতি ট্রি ট্রি করে ডাকল না? শুকনো পাতা মাড়িয়ে ভারী পায়ে দৌড়ে গেল কে? বাঘ কি?

শার্দুল রায় ভয় পেলেন না। কিন্তু সতর্ক হলেন, শিকারীর খুবই সাবধান হওয়া প্রয়োজন। চারিদিকে তীক্ষ্ণ নজর রেখে তিনি জলা থেকে ঝোপের মধ্যে সরে এসে গা ঢাকা দিয়ে হাঁটতে লাগলেন। হাতে উদ্যত বন্দুক, নাকের পাটা ফুলে ফুলে উঠছে গন্ধটা ধরবার চেষ্টায়।

হঠাৎই একটা শাল জঙ্গল পেরিয়ে একটা গাছের আড়ালে থমকে দাঁড়ান শার্দুল।

না, কোন ভুল নেই। অবিশ্বাস্য! গন্ধটার উৎস কোথায় তা তাঁর তীক্ষ্ণ চোখ ধরে ফেলেছে।

আরো কিছুক্ষণ গাছের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে রইলেন তিনি। শিকারকে

জানতে দিতে নেই যে শিকারী আশে পাশে রয়েছে। শিকারীকে ছায়ার মতো নিঃশব্দ হতে হয়।

একটু দম নিলেন শার্দুল। তারপর বন্দুকটা বাগিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে লাগলেন। খুবই কষ্ট হচ্ছিল, হাত পা ছড়ে যাচ্ছিল কিন্তু শিকারে এসে ওসব গ্রাহ্য করলে চলবে কেন। হামা টেনে তিনি তার লক্ষ্য বস্তুর কাছে এগিয়ে গেলেন। চোখে দেখে তিনি মনে মনে মাপ জোক নিচ্ছিলেন। হ্যাঁ এবার বন্দুকের পাল্লার মধ্যে এসে গেছে শিকার। শুধু নিশানটা ঠিক থাকলে হয়।

শার্দুল বন্দুক তুললেন। অনেকক্ষণ ধরে খুব মন দিয়ে টিপ করলেন। মনে মনে ডাকলেন জয় মা কালী, জোড়া পাঁঠা দেব মা। তার পরেই গুড়ুম করে বন্দুকের শব্দ, চারিদিকে ধোঁয়ায় ধোঁয়া। চুপ করে কি যেন পড়ল সামনে। শার্দুল ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন চোখ বুজে। খুলতে ভয় হচ্ছে। যদি দেখেন, এবারেও ফসকেছে?

তারপরেই ধীরে ধীরে চোখ খুলেই শার্দুল আনন্দে বিস্ময়ে অবাক। এতদিনে ......এতদিনে তাঁর নিশানা নির্ভুলভাবে লক্ষ্যভেদ করেছে। জয় মা! জয় মা! জোড়া পাঁঠা দেব মা! শার্দুল বন্দুক ফেলে দৌড়ে গিয়ে শিকার দুটো বুকে তুলে নিলেন। নিয়ে ভারী আদর করতে লাগলেন দুটোকে। দু' দুটো পাকা তাল এক এক গুলিতে নামিয়ে এনেছেন তিনি। বহুকাল তাল খাওয়া হয়নি। আজ বড়া ভেজে তালের ক্ষীর করে মহানন্দে খাবেন শার্দুল। নিজের হাতে শিকার করা তালের স্বাদই আলাদা।

"যে মানুষ নিজেকে নিজের শাসনে রাখতে পারে জুড়ি নাই।"

—গৌতম বুদ্ধ

রাজদ্রোহী চার রাজপুরুষ

শিশির কর

'নীলদর্পণের' দীনবন্ধু, 'আনন্দমঠের' বঙ্কিমচন্দ্র, 'পদ্মিনী উপাখ্যানে'র রঙ্গলাল আর 'পলাশীর যুদ্ধের' নবীনচন্দ্র—এই চারজনই ছিলেন পদস্থ রাজপুরুষ। উচ্চ প্রশাসনিক ও বিচার বিভাগীয় দায়িত্ব এঁদের উপর ন্যস্ত ছিল। উচ্চ সরকারী পদে আসীন থেকেও এরাই রাজশক্তির বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন স্বাধীনতা আন্দোলনে, দেশজননীর শৃঙ্খল মোচনে বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে সংগ্রামে।

ইংরেজ নীলকর সাহেবদের অমানুষিক অত্যাচারের মর্মস্পর্শী চিত্র ফুটে উঠছে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকে। কতিপয় অর্থগৃধ্নু বিদেশীর লোভে সোনার বাংলা কীভাবে শ্মশানে পরিণত হয়েছে তার ছবি আমরা পাই ওই নাটকে। এই নাটকটি সম্পর্কে ইংরেজ রাজপুরুষেরা এত ভীত হয়েছিল যে এর ইংরেজী অনুবাদ করার অভিযোগে রেভারেণ্ট লঙ সাহেবের জেল হয় (অনুবাদটি নাকি আসলে মাইকেল মধুসূদন দত্ত করেন)। সরকারী অফিসার দীনবন্ধুকে এর জন্য যথেষ্ট মূল্যও দিতে হয়েছে চাকুরির ক্ষেত্রে। পদস্থ ইংরেজ আমলারা তাঁকে ন্যায্য প্রমোশন থেকে বঞ্চিত করেন।

বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্রও ছিলেন একজন পদস্ত রাজপুরুষ। এযুগে ভাবলেও বিস্ময় লাগে যে একজন ইংরেজ কর্মচারীর লেখনী থেকে এই বন্দেমাতরম সঙ্গীত, এই আনন্দমঠ উপন্যাসের জন্ম। এই সঙ্গীত, এই উপন্যাস আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে কী অসীম অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে তা ইতিহাসের পাতায় পাতায় লেখা আছে। তাই সে যুগে 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীতটি একাধিকবার নিষিদ্ধ হয়েছিল। তখন 'আনন্দমঠ' ইংরেজ রাজপুরুষদের বিষ নজরে পড়ে ছিল। যেখানেই তারা পেয়েছে, 'আনন্দমঠ' আটক করেছে। এর লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে ইংরেজ আমলারা প্রতিশোধ নিতে কসুর করেনি। বঙ্কিম যাতে তাঁর অতিপ্রিয় 'বঙ্গদর্শন' সম্পাদনা না করতে পারেন এবং আর না লিখতে পারেন, সেজন্য তাঁকে রোডসেসে বদলী করা হয়। বঙ্কিমের নিজের ভাষায়—

"বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "নবীন কথাটা ঠিক। এ অহঙ্কারটুকু না থাকিলে মরিয়া যাইতাম। একটা গল্প শুন। বহরমপুরে বদলী হয়ে গেলাম। এতে তো রোডসেস ইত্যাদি এক রাশি কার্য্যের ভার কালেক্টর বেটা জিদ্ করিয়া 'বঙ্গদর্শন' ও আমার লেখা বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে maliciously আমার ঘাড়ে চাপাইল। তাহাতে দর্শকের জ্বালায় অস্থির হইলাম। যে আসে, সে যে হুঁকা লইয়া বসে, আর উঠেনা। আমি দেখিলাম আমার লেখা পড়া বন্ধ হইল। তখন আমার গৃহদ্বারে এক নোটিশ দিলাম যে, কেউ আমার সাক্ষাৎ পাইবেন না। তারপরদিন হইতে সমস্ত বহরমপুরে রাষ্ট্র হইল—'বটে! বেটার এমন দেমাক! থাক তাহার বাড়ীর আসে পাসে কেউই যাইবো না। আমিও নিশ্চিন্ত হইলাম।"

'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়?' আশ্চর্য্য! এই কবিতার লেখকও কি একজন পদস্থ রাজপুরুষ? হ্যাঁ। সে যুগটাই এই স্ববিরোধীদের যুগ—যাকে বলা হয় ঊনবিংশ শতাব্দী বাংলার নবজাগরণের যুগ। পদস্থ সরকারী আমলা রঙ্গলালই তাঁর 'পদ্মিনী উপাখ্যানে'র মাধ্যমে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করলেন। সে যুগে বাঙ্গালী তরুণদের মুখে মুখে ফিরত "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়?" রঙ্গলালের উপরেও নেমে এল সরকারী রোষবহ্নি। চললো যত্রতত্র বদলী। বন্ধ হলো প্রমোশন।

'পদ্মিনী উপাখ্যানে'র মত 'পলাশীর যুদ্ধ' ও জনপ্রিয়তায় উচ্চতম শিখরে উঠেছিল। তরুণদের মনে দেশপ্রেমের বীজ বপন করেছিল নবীনচন্দ্রের 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্যটি। পলাশীর প্রান্তরে অস্তমিত স্বাধীনতার সূর্যকে আবার দীপ্যমান করার অনুপ্রেরণা পেয়েছিল বাঙ্গালী এই কাব্যে। স্বভাবতই তাঁর প্রতি সরকারী পদস্থ আমলারা প্রসন্ন হননি যদিও তিনি অতি দক্ষ অফিসার ছিলেন। তাঁর পাণ্ডিত্যে দক্ষতায় ও স্বভাবের মাধুর্য্যে মুগ্ধ হয়ে অনেক ইংরেজপুরুষ ও তাঁর বন্ধু হয়ে উঠেন। তথাপি সরকারী রোষ থেকে তিনি রেহাই পান নি। তাঁর জীবনী পড়লে আমরা দেখি যে, নবীনচন্দ্রকে বারবার কীভাবে হেনস্তা করা হয়েছে। দীর্ঘদিন নিষ্ঠা ও দক্ষতার সঙ্গে কর্তব্য সম্পাদনের পরও তাঁর প্রাপ্য প্রমোশন ও প্রথম শ্রেণী থেকে তাঁকে বঞ্চিত করা হয়।

এই চারজন রাজপুরুষই ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত ও প্রভাবিত হয়েও ইংরাজের বিরুদ্ধে লেখনি ধরেছিলেন। এদেশে ইংরাজি শিক্ষার প্রবর্তনই ইংরেজের

পক্ষে কাল হয়েছিল। এই শিক্ষায় এদেশের মানুষের মনে দেশপ্রেম, স্বাধীনতার স্পৃহা সঞ্চারিত করেছিল। এই ইংরাজি জানা মানুষেরাই স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন—প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে। দীনবন্ধু, বঙ্কিম, রঙ্গলাল, নবীনচন্দ্র পদস্থ রাজপুরুষ হয়েও তাই রাজদ্রোহী। আমাদের মুক্তি সংগ্রামে তাঁদের অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

কর্ত্তাবাবু

প্রশান্ত কুমার ঘোষ।

বাবু প্রতাপচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় এতদাঞ্চলের একছত্র অধিপতি। জমিদার বংশের একমাত্র ধারক ও বাহক। চৌধুরী পরিবারের নামডাক বহুদূর বিস্তৃত। আশে পাশের আর পাঁচটি গ্রামের লোক এক ডাকেই চৌধুরী পরিবারের প্রতাপ-চন্দ্রকে চেনেন। পিতৃপুরুষের আভিজাত্য মেজাজ প্রভৃতি রক্ষায় প্রতাপচন্দ্র ছিলেন সদা-তৎপর। লক্ষীদেবীর অঢেল করুণা তাহাদের আভিজাত্যকে অনেকাংশে বৃদ্ধি করিয়াছিল। বিশাল অট্টালিকার সামনের গ্রামের রাস্তাটুকু বাঁধাইয়া চৌধুরী মহাশয় তাহাদের বংশের আভিজাত্যের অস্তিত্ব সম্পর্কে সকলকে সচেতন রাখিয়াছেন বলিয়াই মনে হয়।

বেলা তখনও দ্বিপ্রহরে গড়ায় নাই। চৌধুরী মহাশয় তাহার অট্টালিকার গাড়ী বারান্দায় আরাম কেদারায় উপবেশন করিয়া পথের প্রবাহ আনমনে দেখিতেছেন। বিশ্বস্ত ভৃত্য ভজহরি সদাসর্বদা তাঁহার পাশে দণ্ডায়মান, আজ্ঞা পালনের অপেক্ষায়। প্রতাপচন্দ্রের আদেশে ভজহরি তামাক সাজিতে ব্যস্ত। হঠাৎ কর্ত্তার হাঁকে ভজহরি সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। কর্ত্তার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া রাস্তার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

কর্ত্তা শুধাইলেন, ছাতা মাথায় দিয়ে কে যায় ওখান দিয়ে ?

কর্ত্তার জিজ্ঞাসা শোনামাত্রই ভজহরি নিমেষে নিজের কর্ত্তব্য ঠিক করিয়া ফেলিল। বলিল, অসিত পরামাণিক, আস্পর্ধা দেখ দেখি, আমি এখনই ধরে আনছি, বলিয়াই তীরবেগে রাস্তার দিকে ধাবমান হইল।

কয়েক মুহূর্ত পরে অসিত পরামানিক সহ ভজহরি সেখানে হাজির। ততক্ষণে অসিত বুঝিতে পারিয়াছে সে কতঁটা অন্যায় করিয়াছে।

নতমস্তকে, করজোড়ে কাঁদ কাঁদ স্বরে অসিত সমানে বলিয়া চলিয়াছে, এবারের মত মাপ করুন কর্ত্তা বড় অন্যায় করেছি আর করব না। এবারের মত মাপ করে দিন হুজুর, দেখবেন হুজুর আরে ভুল হবে না।

ভজহরিও চুপ করিয়া নাই। সে কর্ত্তার হইয়া অসিতকে বলিয়া চলিয়াছে, কালে কালে একই হল, তোমার এতবড় আস্পার্ধা, কর্ত্তার বাড়ির সামনে দিয়ে, পায়ে জুতো পরে, মাথার উপর ছাতা দিয়ে, ঘাড় উচু করে অন্য দিকে তাকিয়ে, বেমালুম চলে যাচ্ছে? কি অনাসৃষ্টি। মাণ্যগণ্যি কথাটা একেবারেই ভুলতে বসেছ? এতবড় অপমান। তোমার নরক গমন একেবারে বাধা।

কর্ত্তার মেজাজও তখন রীতিমত চড়া হইয়া বসিয়া আছে। তিনি নিজের পায়ের নাগরাইখানা পা দিয়া আগাইয়া দিলেন ভজহরির দিকে। জুতাপেটা কর বেটাকে জীবনে যেন এ ভূল আর না করে। অসিতকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, তোর বাপ ঠাকুরদা এ বাড়ীর সামনে দিয়েই যাতায়াত করেনি, আর তুই কিনা, —ইতিমধ্যে ভজহরি আজ্ঞা পালন করিতে শুরু করায় কর্ত্তার কথায় ছেদ পড়িল।

বেশ কয়েক ঘা মারিবার পর ভজহরিও ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। অসিত ও সমানে কাঁদিতেছে ও কহিতেছে এবারটি মাপ করেন কর্ত্তা, আর ভুল হবে না।

ভাল করে শিক্ষা দে বেটাকে, কর্ত্তার এই আদেশে ভজহরি আবার সপাটে শুরু করিল অসিতকে একটা ভাল শিক্ষা দেওয়ার কাজ। অসিতও সমানে আবেদন করিয়া চলিল, আর হবে না কর্ত্তা, আর করব না কর্ত্তা, ।—কী খেয়াল হইল, হঠাৎ কর্ত্তাবাবু ভজহরিকে থামিতে বলিলেন।

অসিতের পরিষ্কার জামা-কাপড়ের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া কর্ত্তা বেশ পুলকই অনুভব করিলেন। স্মিত হাস্যে, অবহেলা ভরে জিজ্ঞাসা করিলেন, তা এই দুপুর রোদে জামাই সেজে কোথায় চলেছিলি?

গদগদস্বরে অসিত কহিল, পাশের গায়ে আমার বোনের বাড়ী হুজুর; এক নিমেষেই বলিয়া ফেলিল, একজন খবর দিয়ে গেল বোনটার হঠাৎ ভারী অসুখ করেছে।

কথাটা শুনিয়া কর্ত্তা একটু গম্ভীর হইয়া গেলেন; একটু থামিয়া বেশ সহজ ভাবেই বলিলেন, তা এই দুপুরে যাচ্ছিস, খাওয়া-দাওয়া করেছিস?

—না হুজুর, অভিমানের সুরে অসিত জবাব দিল।

এবার ভজহরিকে লক্ষ্য করিয়া কর্ত্তা বলিলেন, এক্ষুণি ওর খাওয়ার বন্দোবস্ত কর।

ভজহরি, অসিতকে লইয়া সাথে সাথে গৃহ অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল আহারের উদ্দেশ্যে।

কর্ত্তা আরাম কেদারায় বসিয়া উদাসভাবে কি যেন ভাবিয়া চলিয়াছেন। হয়তো কোন হিসাব নিকাশে ব্যস্ত ছিলেন। হঠাৎ কি খেয়াল হইল অসিতের খাওয়ার তদারকি করিবার জন্য ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

অসিতের খাওয়া ততক্ষণে প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। কর্ত্তা অসিতের থালার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিলেন, একবাটি দুধের সহিত মাত্র একটি কলা!

অতিথির প্রতি এরকম আচরণে কর্ত্তা ক্ষোভ প্রকাশ করিলেন। ত্রুটি সংশোধনের জন্য তৎক্ষণাৎ এক কাঁদি কলা আনিয়া দিবার জন্য আদেশ জারি করিলেন।

কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে এককাদি কলা লইয়া ভজহরি সেখানে হাজির। কর্ত্তার আদেশ করিলেন এক একটি করিয়া ঐ পঞ্চাশটি কলা ওকে খাওয়াইতে হইবে।

কথামত কাজ শুরু হইয়া গেল। দু'একটি খাইয়াই অসিত হাঁপাইয়া উঠিল। খাইতে লাগিল ও সাথে সাথে কর্ত্তাকে অনুরোধ করিতে লাগিল, ও কর্ত্তা আর খাওয়া যাবে না, আর মাত্র একটা ব্যস। ঐ বলা পর্য্যন্তই, এর বেশী কিছু বলিবার বা করিবার উপায় অসিতের নাই।

কর্ত্তা বলিয়া চলিলেন, আরও দাও।

অসিত এবার সত্যিই অসহায় হইয়া পড়িয়াছে। করুণ স্বরে আবেদন করিল, আর পারব না কর্ত্তা, আর খেলে মরে যাব কর্ত্তা।

কর্ত্তা এবারও বলিলেন, আরও দাও।

অসিত এবার মরিয়া, অনুনয়ের সুরে বলিল, ও কর্ত্তা এদের বারণ করেন গো কর্ত্তা, মরে যাব কর্ত্তা, বোনটার কাছে আর যাওয়া হবে না কর্ত্তা।

'ঢের হয়েছে আর নয়', বজ্রকণ্ঠে কর্ত্তার এই ঘোষণায় সকলেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল।

আহার শেষে যাইবার উদ্দেশ্যে অসিত এবার কর্ত্তার সামনে হাজির হইল অনুমতির অপেক্ষায়।

কর্ত্তা শুধাইলেন, বোনের অসুখ, তাকে দেখতে যাচ্ছিস, ফলমূল কিছু নিয়ে যাচ্ছিস না, বলি এই গাঁয়ের মানসম্মান কি আর কিছু থাকবে?

অসিত চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কারণ, ফলমূল কিনিবার মত পয়সা তাহার কাছে কিছুই নাই। হঠাৎ খবর পাইয়াছে এইটুকু সময়ে কে আর ধার

দিবে। গায়ের সম্মানের কথা সে একদম চিন্তাই করে নাই। সেটা আর প্রকাশ করিল না। চুপ করিয়া ভৎর্সনা মানিয়া লওয়াই শ্রেয় মনে করিল।

কর্ত্তা ভজহরিকে আদেশ করিলেন, ওর বোনের জন্য মাসখানেকের ফলের বন্দোবস্ত এখুনি করে দাও। ভজহরি ছুটিল অন্দর মহলে।

অসিত অবনত মস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল আর মনে মনে বলিল, এই না হলে জমিদার বাবু। আমাদের ছোটকর্ত্তা আর যাই হোক লোকটা ভাল।

সমস্ত নী·বতা ভাঙ্গিয়া কর্ত্তা আবার শুধাইলেন, বোনের শ্বশুরবাড়ীর অবস্থা কেমন ?—অসিত জানাইল, মোটেই ভাল ' না। দু'বেলা দুমুঠো কোনক্রমে জোটে।

কর্ত্তা বেশ উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, এমন ঘরে বোনের বিয়ে দিলি কেন ? দাদা হয়েছিস বোনের বিয়েটাও দিতে পারলিনা ভাল ঘরে ?

অসিত কিন্তু একটুও দুঃখিত হইল না। বরং মনে মনে হাসিল আর বলিল, কর্ত্তা এতো আমাদের সব ঘরেই একই·অবস্থা, আমার ভাগ্যে কি আলাদা হবে !

কর্ত্তা এবার খানিকটা সহানুভূতির স্বরেই বলিলেন, ঔযুধ, বৈদ্যি এসবের কি করবি ?

অসিত যথারীতি চুপ। কর্ত্তার মুখের উপর কোন কথার উত্তর দেওয়া একেবারেই নিয়মের বাইরে। সে অন্যায়ের কোন ক্ষমা নেই।

নায়েব মশাইকে ডাকাইরা কর্ত্তা অসিতকে বিশ টাকা দেওয়ার আদেশ জারি করিলেন। নায়েব মশাই কিছু বলিতে চাহিতেছিলেন। কর্ত্তা বলিলেন, এখুনি ও যাবে ওর বোনের অসুখ।

ইতিমধ্যে ফলের ঝুড়ি লইয়া ভজহরি ও আর একজন চাকর সেখানে হাজির। একমাসের উপযোগী ফল। সেতো আর কম হইলে চলিবে না। ঝুড়ি দেখিয়া অসিতের মাথায় হাত। এই ভারী ঝুড়ি লইয়া ভিন গাঁয়ে সে যাইবে কেমন, করিয়া। এমন সময় নায়েব মশাই আসিয়া টাকা বিশটা দিয়া গেলেন। অসিতের কিন্তু মাথায় চিন্তা ঢুকিয়াছে কি করিয়া ঐ ভারী বোঝা লইয়া অতটা রাস্তা সে যাইবে। এই গায়ে তাহার মোট বহিবার মত অন্য কেহই নাই। কি করিবে ঠিক করিতে পারিতেছে না।

হঠাৎ কর্ত্তাবাবু বজ্রস্বরে কহিয়া উঠিলেন, হতভাগা, হারামজাদা তোর বোনের অসুখ আর তুই কিনা এখনও দাঁড়িয়ে আছিস।

বিপিন বহুরূপী

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

ছেলেবেলায় আমাদের গাঁয়ে বহুরূপী আসত। তার নাম বিপিন। কোথায় ওর বাড়ী ছিল, কে জানে। নানা রকম অদ্ভুত মূর্তি ধরে সে আসতো। কখনও পাগল, কখনও সন্ন্যাসীও সাজতো। গাঁয়ে এলে ছেলে বুড়ো সবারই সেদিনটা ছুটির দিন। বিপিনের পোঁটলায় থাকত নানা রকমের সাজ। ফরমাস করলে মানত। আমি বলেছিলাম, হনুমান সেজে সত্যি গাছে উঠে চমৎকার হুপ হুপ চেঁচামেচি করে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল।

সে বাঘ-ভাল্লুক ও সাজতে পারত।

তবে সবচেয়ে জমে যেত চৈত্রের শেষ দিন। সংক্রান্তিতে হত গাজন আর হোম। ছোটখাট মেলা বসে যেত। কতজন কত সং সেজে গাইত। কিন্তু বিপিনের মতো কেউ নয়। সন্ধ্যার পর মেলা যেত ফুরিয়ে। তখন নির্জন শিব মন্দিরের চত্বরে দাঁড়িয়ে বিপিন সাজপোষাক খুলিত। তারপর একটি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম সেরে আবছা অন্ধকারে মাঠের পথে মিলিয়ে যেত।

বিপিন কতরূপে এসেছে। কখনও বংশীধারী কৃষ্ণ, কখনও চক্রধারী নারায়ণ, কখনও ত্রিশূলধারী শিব। কিন্তু সেবার এলো এক বিকট মূর্তিতে। সারা গা ক্ষত বিক্ষত, কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্থ মানুষের রূপ। হাতে একটা লাঠি, কাঁধে যথারীতি ঝোলা। শিউরে উঠে বললুম, বিপিনদা! এ কী সেজেছ? ছিঃ! এ সাজ নয় বিপিনদা—খুলে ফেল শিগগির। বিপিন করুণ হাসল।-খোকাবাবু এ সাজ খোলা যাবে না। বললুম—কেন খোলা যাবে না বিপিনদা?

বিপিন বলল—এ আমার শেষ সাজ খোকাবাবু। আমার সারা গায়ে ঘা দেখছ, তা বিধাতা পরিয়ে দিয়েছেন। আমার মহাব্যাধি হয়েছে। ভিক্ষে করে খাচ্ছি।

ভয়ে সেদিনও সরে এসেছিলুম, দেখেছিলুম, বিপিন বহুরূপী লাঠিতে ভর দিয়ে অতিকষ্টে চলেছে।

মনে মনে বলেছিলুম, ঈশ্বর যদি সত্যি কোথাও থাকো, তবে ওর এই ভয়ঙ্কর সাজটা বদলে দিও। ঈশ্বর কী করেছিলেন, আজও তার খবর জানা নেই।

ঝিঙ্গা পাড়ার ঠোঙ্গা বাবু

—অমৃতলাল চক্রবর্তী

ঝিঙ্গা পাড়ার ঠোঙ্গা বাবু ঠিক করলেন সেবার,
গানে ভুবন ভরিয়ে দেবেন বাংলা থেকে বিহার !
যেমনি ভাবা তেমনি কাজ এমনি কর্মবীর,
সুরের গুরু খুঁজে বেড়ান কোলকাতা - কাশ্মীর ।
মনের মত গুরু খুজে পান না তার দেখা,
শোকে দুঃখে হারিয়ে যান হলো না গান শেখা ।
মাস গেল বছর গেল হঠাৎ দেখি ভাই,
ঠোঙ্গা বাবু বাড়ী এলেন কণ্ঠে কথা নাই ।
কন না কথা খান না কিছু ঘুমান না সারা রাতে,
শুধু রাত জেগে গলা সাধেন দাঁড়িয়ে বাড়ীর ছাতে ।
মনের মতন গুরু যখন এদেশেতে নাই,
স্বয়ং তিনি গান শোনাবেন গুরু দরকার নাই ।
আওয়াজ করে রেওয়াজ করেন রাতের পর রাতে,
পাড়ার যত কুকুর ছিলো যোগ দিল তার সাথে ।
পাড়ার লোকে চটে গিয়ে বদ্যি ডেকে শুধান,
"ঠোঙ্গা বাবুর গলাটাকে ঔষধ দিয়ে কমান ।"
বদ্যি গলা দেখে বলে, "কঠিন ব্যামো ভাই,
ধেড়ে ইঁদুর গলায় গেছে বাঁচার আশা নাই ।
তবে বলি উপায় আছে শিক ঢুকিয়ে গলায়,
নিচের দিকে ঠেলে দিলে ঠোঙ্গা বেঁচে যায় ।"
এই না শুনে ঠোঙ্গা বাবুর ভাল যারা চান,
জোর করে তার গলায় শিক ঢুকিয়ে দেন ।
ঠোঙ্গা বাবু কেঁদে ওঠেন, বলে ওঠেন "ভাইরে,
ঘাট হয়েছে ঘাট হয়েছে আর নাহি গান গাইরে ।।"

জ্যোতির স্ফুলিঙ্গ

—উমা দেবী

(১)

নিস্তব্ধ বিষণ্ণ এই তরুণের চোখে

আমার প্রাণের আলো কাঁপে।

(২)

অসম্ভব আছে যত অলীক কল্পনা

জ্যোতির স্ফুলিঙ্গ হয়ে ঝরে....

মাটির উপরে।

(৩)

চৈত্রের পড়ন্ত রৌদ্রে বিবর্ণ প্রহর

ঠাণ্ডা তরমুজ খোঁজে পিপাসু অধর।

(৪)

লজ্জায় শিউরে ওঠে পঞ্চদশী বালা

যদিও শোবার ঘর নিতান্ত নিরালা।

কর্তাদের সময় নেই

(ক্রীড়া সাংবাদিক-যুগান্তর)

বিপুল বন্দ্যোপাধ্যায়

বড়ো বড়ো রুই কাত্‌লা যেমন পুকুরের চুনো পুঁটিগুলোকে এন্তার সাবাড় করে দেয়, রাজ্যের বড়ো সাধের, বড়ো পেয়ারের ফুটবল, ক্রিকেটও এই রুই কাতলার মত মস্ত বড়ো হাঁ মেলে ছোটখাট খেলা-গুলিকে গিলে গিলে সাবাড় করে দিচ্ছে। অবস্থাটা আমরা ঠাহর করতে পারছি বটে কিন্তু ওদের রাক্ষুসে খিদে থেকে টেবল টেনিস, ব্যাডমিন্টন, কাবাডি, খো খো কে জোরদার করে টিকিয়ে রাখার জন্য বাস্তবে আমরা কিছু করতে পারছি কি?

অন্য খেলার কথা থাক টেবল টেনিসের কথাই ধরুন না? শুধু পশ্চিম বাংলা নয়, শুধু ভারতবর্ষই নয়, গোটা দুনিয়াকে তাক লাগিয়ে কলকাতার গুটি কয়েক ছেলে অসাধারণ সাংগঠনিক নৈপুণ্যে ১৯৭৫ সালে যে বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতা সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন করলো, বাঙ্গালী ছেলেদের সেই বাংলার সামগ্রিকভাবে টেবিল টেনিসের চেহারাটি কি? একটি অপুষ্ট শিশু বৈ তো নয়! কেন এমন হোল? সাংগঠনিক গলদ, দুর্বলতা?

দুর্বলতা অবশ্যই কিছুটা রয়েচে কিন্তু শুধু তার জন্যই টেবল টেবিসের ছোট ছোট খেলাগুলি মার খাচ্ছে না, মার খাচ্ছে আমার এবং আমার মত অন্যান্য 'ক্রীড়ামোদী'দের নেতিমূলক মনোভাবে।

কলকাতার আর সারা পশ্চিমবাংলায় লোক আজকাল ফুটবল নিয়ে, ক্রিকেট নিয়ে তা ধিন্, তা ধিন্ নাচ্‌চে! ফুটবল, ক্রিকেটই এখন পুকুরের বড় বড় রুই কাতলা এবং ওদের রাক্ষুসে খিদের মুখেই দিনকে দিন দৃশ্যতঃ ছোট খেলাগুলি মার খেয়ে যাচ্ছে। সব চেয়ে বিস্ময়ের কথা এই যে, ফুটবল ক্রিকেটে কাগে ভাগ্যে ভারতের ভাগ্যে সিঁকে ছেঁড়া গৌরব নিয়েই ছোট বড় আমরা সবাই পরম পরিতৃপ্তিতে ঢেঁকুর তুলছি, অথচ যে সমস্ত খেলা-গুলোয় ভারতীয় ছেলেমেয়েদের মোটামুটি সম্ভাবনা রয়েছে, সে দিকে কি অনীহা কি ওদাসীন্য!

অস্বীকার করার উপায় নেই যে আজকের এই মুহূর্তে ফুটবল, ক্রিকেট শহরের পথ বেয়ে গ্রামের প্রত্যন্ত প্রদেশে প্রবেশ করেছে। মফঃস্বলের মাঠে ঘাটে বল পড়ে, ব্যাট নড়ে। কিন্তু টেবল টেনিস, ব্যাডমিন্টন? না ফুটবল ক্রিকেটের তুলনায় কিছুই নয়। টেনিস ব্যাডমিন্টন কি ফুটবল ক্রিকেটের চাইতে ব্যয় সাধ্য খেলা? তাও নয়। ফুটবল, ক্রিকেটে একখণ্ড মোটামুটি চলন সই মাঠের প্রয়োজন এবং আমরা জানি এই মাঠ বানাতে খরচ কত?

টেবল টেনিসে কিন্তু ঐ রাজসিক ব্যায়ের অবকাশ নেই। প্রয়োজন একটি টেবল এবং গুটি-কয়েক বলের, ব্যাটের। টেবলের জন্য এককালীন কিছু টাকার দরকার হয় বটে কিন্তু ক্রিকেট ফুটবলের তুলনায় তা নিত্যন্তই নগণ্য। বিস্তর জায়গারও প্রয়োজন পড়ে না টেবল টেনিস খেলতে। অর্থাৎ 'মাঠ'-এর সমস্যাও কোন প্রতিবন্ধকই নয়। স্কুল, কলেজ লাইব্রেরী, ক্লাবে বিশেষতঃ মফঃস্বলে ঐ ধরনের সংস্থাগুলিতে টেবল টেনিসের চর্চা সহজেই চলতে পারে। কিন্তু অর্থ? গ্রামাঞ্চলে বা মফঃস্বল শহরাঞ্চলে প্রয়োজনীয় অর্থের উৎস কোথায়? আমার প্রস্তাব: যে উৎসাহে, যে জাঁকজমকে ক্লাব, সংঘ, স্কুল কলেজের বার্ষিক অনুষ্ঠান, বাণী অর্চনা তিথি পালিত হয়, তার কিছুটা কাট ছাঁট করলেই অনায়াসে স্বল্প ব্যয় ভিত্তিক টেবল টেনিসের অর্থের সন্ধান পাওয়া যাবে, এ জন্য বাইরের কারও পায়ে মাথা খুঁড়ে মরতে হবে না। রাজ্য ক্রীড়া পরিষদের কাছেও না।

রাজ্য ক্রীড়া পরিষদ নামে খেলাধূলার কল্যান-কামী একটি সরকার লালিত সংস্থা আগেও ছিল, লোক মুখে শুনেছি ঐ সংস্থাটি নাকি এখন পীড়িত, প্রকাশ শ্বাস প্রশ্বাস অদ্যবধি বন্ধ হয়ে যায়নি। অবশ্যই সুখের কথা। কিন্তু প্রশ্ন জাগে—পশ্চিমবঙ্গ, রাজ্য ক্রীড়া পরিষদের কর্মটা কি? শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়ামের সুসজ্জিত কক্ষে ঢাউস চকচকে টেবলে, গদি আঁট' কেদারায় বসে বৈঠকে, খেয়াল খুশি মত মন পসন্দ গোষ্ঠীকে তোয়াজ করা ছাড়া নব গঠিত পরিষদ আর কি কিছু করেছেন? টেবিল টেনিস, ব্যাডমিন্টন ইত্যাদির মত ছোট খেলায় দৃষ্টি দেওয়ার মত সময় কোথায় কর্তাদের?